কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের মহানায়ক সুলতান

মুহাম্মদ আল-ফাতিহ

কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের মহানায়ক সুলতান

মুহাম্মদ আল-ফাতিহ

ড. আলি মুহাম্মদ সাল্লাবি

অনুবাদ

মাহদি হাসান

সম্পাদনা

আবদুল্লাহ আল মাসউদ

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

মুহাম্মদ আল-ফাতিহ

ড. আলি মুহাম্মদ সাল্লাবি

প্রকাশকাল : মে ২০১৯

প্রকাশক

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

অস্থায়ী কার্যালয় : বিক্রমপুর কটেজ, ৩০৯/৬/এ, দক্ষিণ
যাত্রাবাড়ি, মাদরাসা রোড, ঢাকা-১২০৪
+৮৮ ০১৩১৫-০৩৬৪০৩, ০১৪০৩-৩৯ ১৭ ১৮

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার পরিবেশক

মাকতাবাতুল হিজায : ০১৯২৬-৫২০২৫৩
মুস্তাবাব প্রকাশনী : ০১৭৪৮-৯৭৪৯৫৩
মাকতাবাতুন নুর : ০১৮৫৭১৮৯১৪৪

যাত্রাবাড়ি কিতাব মার্কেট পরিবেশক

মাকতাবাতুল আযহার ও অন্যান্য

অনলাইন পরিবেশক

☐ রকমারি.কম, ☐ অথবা.কম, ☐ ওয়াফি লাইফ, ☐ খিদমাহ শপ.কম, ☐ বইকেন্দ্র, ☐ হেল্পফুল শপ

মূল্য : ৳ ৪৮০, UK $ 15, UK £ 10

MUHAMMAD AL FATIH

Writer : Dr. Ali Muhammad Sallabi
Translated by : Mahdi Hasan
Editor : Abdullah Al Masud

Published by

Muhammad Publication

309/6/A South Jatrabari, Madrasa Rd, Dhaka-1204
+88 01315-036403, 01403-39 17 18
https://www.facebook.com/muhammadpublicationBD/
muhammadpublicationBD@gmail.com
www.muhammadpublication.com

ISBN : 978-984-34-6598-6

স্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা বা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।

অর্পণ

হৃদয়ের মণিকোঠায় অঙ্কিত চারটি নাম—মা, বাবা, নানি, মামা।
তাদের নেকহায়াত এবং ইমানি জিন্দেগি কামনায়...

—অনুবাদক

প্রকাশকের কথা

হিজরি সপ্তম শতাব্দী। মোঙ্গলীয়দের আক্রমণে লণ্ডভণ্ড আব্বাসীয় সালতানাত। কনস্টান্টিনোপলের খ্রিষ্টানদের সাথে লড়াইয়ে রোমের সালজুক সালতানাতের প্রাণ ওষ্ঠাগত প্রায়। ইসলামি ইতিহাসের এক চরম দুর্যোগপূর্ণ সময়। ঠিক এই দুর্যোগপূর্ণ সময়ে মেঘের আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে হেসে ওঠে এক নবারুণ সূর্য। দিগ-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে সেই সূর্যের দীপ্তি। ইসলামি সাম্রাজ্যের মেঘলা আকাশকে স্বচ্ছ এবং প্রখর রোদের আকাশে পরিণত করা সেই সূর্যের নাম 'উসমানি সালতানাত'। ইসলামি ইতিহাসের এক সোনালি অধ্যায় জুড়ে ছড়িয়ে যে সালতানাতের ব্যাপ্তি। যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী দোর্দণ্ড প্রতাপের এবং ন্যায়নিষ্ঠার সাথে শাসন করে গেছেন মুসলিম বিশ্ব। একের পর এক রাজ্য বিজয় করে ইসলামকে করেছেন সমুন্নত এবং সম্প্রসারিত। সারা বিশ্ব যাদেরকে জানে 'অটোমান সাম্রাজ্য' নামে। দীর্ঘকাল যাদের কথা চর্চা হয়ে আসছে ইতিহাসের পাতায় পাতায়।

কীভাবে উত্থান হলো এই মহা শক্তিশালী সালতানাতের? কী তাদের পরিচয়? কোথা থেকে তাদের আগমন?

প্রশ্নগুলো যদি আপনার মস্তিষ্কের দরজায় কড়া নাড়তে থাকে, তাহলে মেলে ধরুন 'মুহাম্মদ আল-ফাতিহ'। পেয়ে যাবেন সেই প্রশ্নের উত্তর।

খন্দকের যুদ্ধের সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিগণকে সুসংবাদ দিয়েছিলেন—'অবশ্যই কনস্টান্টিনোপল বিজিত হবে। সেই বিজয়ী শাসক কতইনা উত্তম এবং সেই বিজয়ী বাহিনী কতই না উত্তম।'

সে কালের কুসতানতিনিয়া তথা কনস্টান্টিনোপল। আর আজকের ইস্তাম্বুল—যাকে একসময় বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ একটি শহর হিসেবে বিবেচনা করা হতো। ৩৩০ খ্রিষ্টাব্দে বাইজেন্টাইন সম্রাট প্রথম কনস্টান্টিনের হাতে এ শহরের গোড়াপত্তন হয়। বিশ্ব মানচিত্রে এর অবস্থান ছিল অতুলনীয়। এমনকি এ শহর সম্পর্কে বলা হয়েছে—'যদি সারা দুনিয়া শুধু একটি রাষ্ট্র হতো

তাহলে কনস্টান্টিনোপল হতো সে রাষ্ট্রের রাজধানী হওয়ার জন্য সবচেয়ে যোগ্য শহর'। এ শহর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় থেকেই একে বাইজেন্টাইনরা তাদের রাজধানী বানিয়ে নিয়েছে। বিশ্বের বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুসংবাদ বাস্তবায়ন করার জন্য সেই ৪৪ হিজরিতে হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকাল থেকেই এ শহর বিজয়ের জন্য অভিযান শুরু হয়। এরপর যুগের অতিক্রমকালে আরও বহু মুসলিম সালতানাত এবং শাসকগণ এ শহর অভিমুখে অভিযান পরিচালনা করেন; কিন্তু কনস্টান্টিনোপলের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ করতে অক্ষম হয়ে সকলেই ব্যর্থ মনোরথে ফিরে যান। তবে এ সৌভাগ্য লেখা ছিল উসমানি সালতানাতের সপ্তম শাসক সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদের ভাগ্যলিপিতে। অভূতপূর্ব সব রণকৌশল এবং ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে কনস্টান্টিনোপলের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ করে তিনি ধ্বসিয়ে দেন দাম্ভিক বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যকে। এ বিজয়ের মাধ্যমে তিনি অর্জন করে নেন 'আল-ফাতিহ', অর্থাৎ বিজয়ী উপাধি। ইসলামি ইতিহাস তাকে 'মুহাম্মদ আল-ফাতিহ' নামে চির অমর করে রেখেছে। পশ্চিমারা তার নাম দিয়েছে 'দ্য কনকোয়েরার'।

ইতিহাসের এই মহানায়ক সম্পর্কে জানার জন্য বহু পাঠকের হৃদয়ে জমেছিল প্রবল তৃষ্ণা। তাদের তৃষ্ণা নিবারণেই ব্রতী হয়েছেন লিবিয়ার প্রথিতযশা লেখক, বিশ্ববিখ্যাত ইতিহাসবিদ ও গবেষক ড. মুহাম্মদ আলি সাল্লাবি। ইনসাফের সাথে তুলে ধরেছেন মহানায়ক মুহাম্মদ আল-ফাতিহের ইতিহাস।

এই গ্রন্থটি মুহাম্মদ আল-ফাতিহের কথা বলবে, যিনি ছিলেন কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের মহানায়ক এবং রোমের পরাক্রমশালী শাসক। আরও বলবে তার পিতৃপুরুষদের কথা। যারা সারা জীবন ইসলামকে আঁকড়ে ধরে বেঁচেছিলেন। আর মৃত্যুবরণ করেছেন আল্লাহর কালিমা উড্ডীন করার পথে।

বইটি পাঠকের কাছে আরও বর্ণনা করবে, সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহের সময়ে উসমানি সাম্রাজ্যের উত্থান ছড়িয়ে পড়েছিল দিগদিগন্তে। তখন বিশ্বজুড়ে ছিল উসমানি সালতানাতের চর্চা। তৎকালীন বিশ্বের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সমরাঙ্গণ—মোটকথা, সর্বক্ষেত্রে উসমানি সালতানাতের আলোচনা ছিল সবার শীর্ষে।

তাই এই মহান মনীষী সম্বন্ধে পাঠকের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য 'মুহাম্মদ পাবলিকেশন' প্রকাশ করছে *'মুহাম্মদ আল-ফাতিহ'*। আশা করি, গ্রন্থটি থেকে তৃষ্ণাতুর পাঠক তাদের তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারবে।

বইটি অনুবাদ করেছেন নবীন অনুবাদক মাহদি হাসান। যদিও এটি তার প্রথম অনুবাদ; কিন্তু প্রথম হিসেবে তিনি প্রশংসনীয় অনুবাদ করেছেন। আল্লাহ তার এ খেদমত কবুল করুন এবং ভবিষ্যতে আরও উন্নতি দান করুন।

বইটি সম্পাদনা করেছেন প্রিয় আবদুল্লাহ আল মাসউদ ভাই। তার সঙ্গে পাঠককে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন মনে করছি না। কারণ, ইতোমধ্যে তিনি পাঠকমহলে তার লেখনির মাধ্যমে যথেষ্ট নাম কুড়িয়েছেন। তার কাছে সত্যিই আমরা খুব ঋণী। কেননা, তিনি যথেষ্ঠ আন্তরিকতার সঙ্গে বইটি সম্পাদনা করে আমাদের কৃতজ্ঞতার চাদরে ঢেকে নিয়েছেন। আল্লাহ তার লেখনী আরো সমুন্নত করুন এবং তার ছায়াকে আমাদের ওপর আরও দীর্ঘ করুন।

এ কথা কারও অজানা নয় যে, সত্য ইতিহাসআশ্রিত বই শুধু বই-নয়; বরং তা একটি অমূল্য রতন। সাফল্যের সিঁড়ি। সোনালি জীবনের সোপান। বিশেষ করে মহামানবদের জীবনীসংক্রান্ত বই-পুস্তক আমাদের রুহের খোরাক। আমলের জজবা সৃষ্টির অন্যতম উপায়। তাই এ জাতীয় গ্রন্থ সর্ব-সাধারণের বোধগম্য ভাষায় উপস্থাপন করা জরুরি।

আমরাও চেষ্টা করেছি বইটি যথাসাধ্য সাবলীল ও নির্ভুল করতে। বিশেষ করে বিভিন্ন স্থান, স্থাপনা ও ব্যক্তির সঠিক নাম উল্লেখ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি; কিন্তু মানুষ ভুল, অক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে নয়। ত্রুটি-বিচ্যুতি এড়িয়ে যাওয়া অনেক সময় সম্ভব হয় না। অজ্ঞতাসারে বা অসতর্কতাবশত ভুল-ভ্রান্তি, ত্রুটি-বিচ্যুতি, ভাষা প্রয়োগে জটিলতা বা ভাবের গরমিল থেকে যেতে পারে। পাঠক এগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি ও সংশোধনের মনোভাব নিয়ে অবহিত করবেন বলে আশা রাখি।

পরিশেষে আল্লাহ তাআলা বইটির সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জাজায়ে খায়ের দান করুন। আমিন।

—মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
১৮ শাবান, ১৪৪০ হিজরি

সম্পাদকের কথা

ড. আলি সাল্লাবি আরবের খ্যাতিমান একজন ইতিহাসবিদ। ইসলামি দুনিয়ার ইতিহাসকে কলমের আঁচড়ে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে শুরু করে উসমানি খিলাফত পর্যন্ত সময়কালের বিভিন্ন ব্যক্তি, সাম্রাজ্য ও খিলাফত নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার রচিত গ্রন্থাবলি আরবের সীমা ছাড়িয়ে অনারব নানান দেশে বরিত হয়েছে। অনূদিত হয়ে পৌঁছে গেছে পাঠকের হাতে হাতে। আমাদের দেশেও সাল্লাবি পরিচিত হয়ে উঠেছেন বিগত ক-বছরে। তিনি ও তার বইপত্র এখন আর অপরিচিত কোনো বিষয় নয়। বিশেষত ইসলামি প্রকাশনাজগত ও বইপুস্তকের সাথে যাদের নীবিড় সংযোগ রয়েছে, তারা এর বাস্তবতা অনুধাবন করতে পারবেন।

ইতিহাস নিয়ে অনেক আরব আলেম লেখকই লেখালেখি করছেন। বইপত্র রচনা করছেন। তাদের সবাই কিন্তু সাল্লাবির মতো বৈশ্বিকভাবে গুরুত্ব পান নি। ব্যতিক্রম দু-একজনের কথা বাদ দিলে আরবের সীমানা পেরিয়ে অনারব ভূমিতেও তাদের রচনাকে বরণ করে নেওয়ার মতো অবস্থা তৈরি হয়নি। তার মানে নিশ্চয়ই সাল্লাবির রচনাতে এমন কোনো বিশেষত্ব রয়েছে, যা তাকে অন্যদের থেকে সহজেই আলাদা করেছে। দশজনের ভিড়ে তাকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করেছে। সেই বিশেষত্বগুলোই আমরা খুঁজে দেখার চেষ্টা করব।

মোটাদাগে যেসব বিষয় সাল্লাবিকে অন্যদের থেকে বিশেষত্ব দান করেছে সেগুলো হলো—

ক. তিনি অন্যান্য ইতিহাস-লেখকদের মতো ঘটনার পর ঘটনাকে সাজিয়েই ক্ষান্ত হন না, বরং ঘটনা বলার ভেতর দিয়ে ঘটনার পেছনের অনুঘটককেও তিনি উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করেন। ফলে প্রতিক্রিয়াকে তার মূল ক্রিয়া সমেত জানাটা পাঠকের জন্য সহজ হয়ে যায়। এতে করে বাহ্যিক ঘটনাবলি জানার সাথে সাথে উহ্য থাকা রহস্যও উন্মোচিত হয় পাঠকের সামনে, যা তাকে বিষয়ের গভীরে গিয়ে পুরো ব্যাপারটি বুঝতে যথেষ্ট সহায়তা করে।

খ. ইতিহাসের প্রতিটি চরিত্রকে তিনি গভীর থেকে বিশ্লেষণ করেন। কুরআন-হাদিসের দর্পণে ফেলে খুঁটেখুঁটে তাকে যাচাই করেন। কোন গুণগুলো তাকে ইতিহাসে মহিমান্বিত করল সেটা তুলে আনার চেষ্টা করেন। এটা কেমন যেন সাগর সেঁচে মুক্তো আহরণ করার মতোই শ্রমসাধ্য ও তীক্ষ্ণমেধার কাজ। কারণ, এসব গুণাবলি খুঁজে খুঁজে বের করার পর সেগুলো তিনি কুরআন-হাদিসের ছাঁচে ঢেলে প্রমাণিত করেন, যার জন্য নুসুসের বিস্তৃত জ্ঞান থাকা অপরিহার্য।

গ. সাল্লাবি মূলত ইসলাম ও মুসলিম দুনিয়ার ইতিহাস নিয়ে কাজ করেন। আর এটা তো সর্বজনবিদিত যে, মুসলিম দুনিয়ার ইতিহাস বিভিন্ন অমুসলিম ও তাদের চিন্তাধারাপুষ্ট কিছু নামধারী মুসলিমের হাতে কখনো কখনো কলুষিত হয়েছে। তারা ইতিহাস বিকৃত করার চেষ্টা করেছে। সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্যের চাদরে ঢাকার চেষ্টা করেছে। সেসব মিথ্যা আবার একজন থেকে অন্যজন হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে আরও বহু জায়গায়। তো সাল্লাবি এসব ক্ষেত্রে শুধু সঠিক ও সত্যটা তুলে ধরেই ক্ষান্ত হন না; বরং ভুল, মিথ্যা আর বিকৃতিগুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। এই কাজ করতে গিয়ে প্রয়োজনবোধে মিথ্যাচারকারী ও বিকৃতিকারীদের নামধাম ও বইপুস্তকের হদিস দিতেও তিনি দ্বিধা করেন না। নিঃসন্দেহে এটি তার সৎ সাহস ও সত্যের প্রতি ভালোবাসার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ঘ. সাল্লাবি ইতিহাসে ঘটে যাওয়া প্রতিটি ঘটনার সফলতা ও ব্যর্থতার পেছনের কারণ অনুসন্ধান করেন। এর জন্য তিনি সহায়তা নেন ইলমে ওহির। কুরআন-হাদিসের নির্দেশনাকে মাপকাঠি বানিয়ে তিনি ইতিহাসের সেসব উপাখ্যানকে বিচার করেন। কোনো বিষয়ের অভাব বা পরিপূর্ণতা ইতিহাসের কোনো অংশের ব্যর্থতা বা সফলতার নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে তা তিনি পাঠকের সামনে হাজির করার চেষ্টা করেন। ফলে তার বইগুলো আর প্রচলিত ধারার ইতিহাস-গ্রন্থের মতো থাকে না, বরং তা ইতিহাসের ধারাবর্ণনাকে ছাপিয়ে হয়ে ওঠে এরচে আরও বেশি কিছু। অনেক সময় দেখা যায় ইতিহাসের চিত্র পরম্পরাকে চিত্রিত করার তুলনায় তার এমন ধরনের নিরীক্ষণের পরিমাণই বেশি হয়ে যায়। এর বেশ ভালো কিছু দিক থাকলেও যেসব পাঠক এমন ধারার সাথে পূর্বপরিচিত নন, অনেক সময় এটি তাদের অল্পবিস্তর বিরক্তিরও কারণ হয়ে উঠতে পারে।

এসব বিষয়কে সামনে রাখলে পরিস্ফুট হয় যে, সাল্লাবি প্রচলিত ধারার ইতিহাস-লেখক নন। তার বইগুলোও প্রচলিত ধারার ইতিহাসগ্রন্থ নয়। প্রচলিত ধারার নন বলে তাকে 'ইতিহাসবিদ নন' বলে তুড়ি মেরে উড়িয়ে

দেওয়ার সুযোগও কিন্তু নেই। এখানে যুক্ত করা 'প্রচলিত' শব্দটি দিয়ে সেদিকেই ইঙ্গিত করা হচ্ছে। বরঞ্চ নানান দিক বিবেচনায় সাল্লাবির ইতিহাসের বইতে প্রচলিত ধারার বিপরীত এই রচনা-পদ্ধতির ভেতর আমরা কিছু অনন্যতা ও ব্যতিক্রমরূপের দেখা পাই, যা তাকে ইতোমধ্যেই একটি নিজস্বতা এনে দিতে সক্ষম হয়েছে।

রচনা-পদ্ধতির এই ব্যতিক্রমী রূপের কারণে সাল্লাবিকে অনেক সময় অন্য লেখকদের সমালোচনার পাত্রও হতে হয়েছে। তারা আপত্তির তির ছুড়েছেন এই বলে যে, ইতিহাসে ধর্মবিশ্বাসের অনুপ্রবেশের কী প্রয়োজন? ইতিহাসের সাথে নেতৃবৃন্দের গুণাবলির কী সম্পর্ক? শরিয়ত প্রতিষ্ঠা হলো কি না এর সাথে ইতিহাসের সম্পৃক্ততা কী?

এমন প্রশ্নে সাল্লাবি ভড়কে যাননি। তিনি আত্মবিশ্বাস নিয়েই এসব প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন—

'ইসলামি ইতিহাস এবং তার ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে লেখালেখির নীতিমালা মৌলিকভাবে ইসলামি ভাবনার ওপর নির্ভরশীল। ইসলামি আকিদা এবং তার চাহিদাসমূহই হবে তার নীতিমালা প্রণয়নের, ঘটনাপ্রবাহের ব্যাখ্যা করার এবং তার ওপরে যে কোনো সিদ্ধান্ত দেওয়ার মূলস্তম্ভ।'

সাল্লাবি মনে করেন, ইতিহাস বর্ণনায় শরয়ি উৎসসমূহের সাহায্য নেওয়া উচিত, যাতে যেখান থেকে ইসলামের বিস্তার হয়েছে সে সমাজের চলার নীতি জানা যায় এবং তা যেন শরিয়তের নির্দেশনা অনুযায়ী হয়। তার জীবন ও ভাবনা শরিয়ত মোতাবেক হয়। শরিয়তের শিক্ষা এবং আদেশ-নিষেধসমূহ তার অধিকাংশ কাজেই আল্লাহ তাআলার দিকে আহ্বান করার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করেছে। এমনিভাবে আল্লাহ তাআলার রাস্তায় জিহাদ করা, সুশিক্ষা দেওয়া, একটি প্রশাসনিক ও সামাজিক ভিত্তি সম্বলিত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা এবং ইসলামি সমাজের সাথে পরস্পরের সম্পর্ক স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করেছে।

সাল্লাবি বলেন—'ইসলামি ইতিহাস লিপিবদ্ধকারী এবং ব্যাখ্যাকারীদের জন্য আবশ্যক কিছু শর্ত হচ্ছে, শরয়ি উৎসসমূহের সাহায্য নেওয়া, ইসলামি আকিদা উপলব্ধি করা এবং তা আঁকড়ে ধরা; সেইসাথে যারা তা আঁকড়ে ধরে তাদের ওপর প্রভাবিত আদর্শ লালন করা। যখন এর কোনো একটিতে বিচ্যুতি ঘটবে তখন তার গবেষণা হবে অসম্পূর্ণ, মেকী এবং গবেষকের সাথে সম্পৃক্ত সামাজিক এবং চিন্তাধারাগত অবস্থা দ্বারা প্রভাবিত। এ জন্যই সমসাময়িক অনেকের গ্রন্থের মধ্যে অনেক ভুল হয়েছে। কিছু ভুলের জন্য দায়ী হলো শরয়ি

উৎসের দিকে তাদের প্রত্যাবর্তনের সীমাবদ্ধতা। আর কিছু ভুলের জন্য দায়ী হচ্ছে তাদের চিন্তাচেতনার অস্পষ্টতা এবং ইউরোপের বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেড সম্পর্কে তাদের স্পষ্ট ধারণা না থাকা।'

ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি কুরআনি-পদ্ধতি অনুসরণের চেষ্টা করে থাকেন। এই বিষয়ে তার ভাষ্য হচ্ছে, 'ইতিহাসের বর্ণনার ক্ষেত্রে আমি সেই নীতিই অবলম্বন করেছি যেভাবে কুরআনে ঘটনাসমূহের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এ জন্যই আমি নেতা এবং শীর্ষস্থানীয়দের গুণ বর্ণনা করা, আকিদাগত মাসআলা বর্ণনা করা এবং যে সমস্ত মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং জাতি উজ্জীবিত হয়েছে, সেগুলো স্পষ্ট করার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেছি।' উদাহরণসহ এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত বিবরণ পাঠকগণ এই বইতে লেখকের ভূমিকাটি পড়ে জানতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।

মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ ইতিহাসখ্যাত একজন বীর মুজাহিদের নাম। যিনি ছিলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সল্লামের একটি ভবিষ্যতবাণীর বাস্তবায়নকারী। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন— 'অবশ্যই কনস্টান্টিনোপল এক ব্যক্তির হাতে বিজিত হবে। সেই শাসক কতই-না উত্তম আর সেই বাহিনী কতই-না উত্তম বাহিনী।'

এই উত্তম শাসক হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন মহান বীর মুজাহিদ মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ রাহিমাহুল্লাহু।

পুরো পৃথিবীকে স্বীয় সমর কৌশল দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দেওয়া এই তুর্কী বীরের জীবন-উপাখ্যান নিয়েই রচিত হয়েছে এই বইটি। লেখক ড. আলি সাল্লাবি দুইভাগে ভাগ করে আলোচনাকে এগিয়ে নিয়েছেন। প্রথম ভাগে তিনি উসমানি সাম্রাজ্যের উত্থান নিয়ে আলোচনা করেছেন। শাসকদের ধারাবাহিক ফিরিস্তি পেশ করে তাদের কিছু পরিচিতি, কর্মকৌশল এবং কুরআন-হাদিসের আলোকে একে বিশ্লেষণ করেছেন। এই কাজটি তিনি করেছেন আলোচনাকে একটা ধারাবাহিকতার ভেতর দিয়ে পরিচালিত করার স্বার্থে। নইলে বইয়ের মূল আলোচ্য বিষয়ের সাথে এর প্রাসঙ্গিকতার সূত্র অতটা পরিস্ফুট হয় না। দ্বিতীয় ভাগে বইটির মূল নায়ক মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ, তার বিজয়াভিযান, যুদ্ধক্ষেত্রে তার গৃহীত কর্মকৌশল, রাজত্ব পরিচালনাসহ জীবনের খুঁটিনাটি দিকগুলো তুলে ধরেছেন। সবশেষে সংক্ষিপ্তাকারে পুরো বইয়ে বিবৃত ইতিহাসের সারসংক্ষেপ তুলে ধরেছেন অল্প

কথায়, যা পাঠককে সহজে পুরো বইয়ের ইতিহাসকে এক চুমুকে মনে রাখতে সাহায্য করবে।

বইটি অনুবাদ করেছেন নবীন অনুবাদক মাহদি হাসান। এটি তার প্রথম অনুবাদ; কিন্তু সম্পাদনা করতে গিয়ে তেমনটি মোটেই অনুভূত হয়নি। সামান্য কিছু বিষয় বাদ দিলে সামগ্রিকভাবে তার অনুবাদের প্রশংসাই করতে হয়। পড়তে গিয়ে সাবলীল আর সতেজই মনে হয়েছে। ভবিষ্যতে অনুবাদকর্মে আরও মনোনিবেশ করলে তিনি উন্নতি করতে পারবেন বলে আমি বেশ আশাবাদী। আল্লাহ তার কলমকে আরও শাণিত করুন। পাশাপাশি বইটির সাথে যুক্ত সবাইকে জাযায়ে খাইর দান করুন, আমিন।

—আবদুল্লাহ আল মাসউদ

১৯ রজব ১৪৪০ হিজরি
২৭ এপ্রিল ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

অনুবাদকের কথা

আলহামদু লিল্লাহ। সুম্মা আলহামদু লিল্লাহ। এ মহান খেদমত সম্পন্ন করার তাওফিক দান করায় সুমহান আল্লাহ তাআলার অশেষ কৃতজ্ঞতা আদায় করছি।

একটা প্রশ্ন প্রায়ই আমাদের ভাবনার দরজায় কড়া নেড়ে যায়—আমাদের আসল পরিচয় কী? আমরা তখন মানুষ হিসেবে পরিচয় দেব নাকি মুসলিম হিসেবে পরিচয় দেব তা ভাবতে গিয়ে দ্বিধায় পড়ে যাই। আমরা অবশ্যই মানুষ। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজীব। এটা দেখামাত্র বুঝে আসে। আলাদাভাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কিছু নেই। আমরা মুসলিম। এটাই আমাদের প্রকৃত পরিচয়। আমাদের শৈশবকালেই আমাদের আকিদার ভিত গড়ে দেওয়া *তালিমুল ইসলাম* গ্রন্থে পড়েছিলাম, 'তুম কৌন হো' অর্থাৎ 'তোমার পরিচয় কী?' এর জবাবে আমরা পড়েছিলাম, 'হাম মুসলমান হুঁ' অর্থাৎ 'আমি একজন মুসলিম।' মুসলিম পরিচয় দিতে দ্বিধা-সংশয়ের কিছু নেই; বরং মুসলিম পরিচয় দেওয়া কতটা সম্মানজনক তা আমরা আমাদের অতীত জানলেই বুঝতে পারব।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের সাথে বলতে হয়, আমরা ভুলে গেছি আমাদের স্বর্ণসময়, আমাদের বর্ণাঢ্য অতীতকে। সেই সাথে ভুলে গেছি আমাদের আত্মপরিচয়। তাই আমাদের অবস্থা হয়ে গেছে সেই ব্যাঘ্রশাবকের ন্যায়, যে বকরিপালের সাথে মিশে গিয়ে বকরির মতো আচরণ শুরু করেছিল। সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদবি রাহিমাহুল্লাহু তার নন্দিত গ্রন্থ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين এ বলেছেন, মুসলামানদের অধঃপতনের সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে আত্মপরিচয় ভুলে যাওয়া।

এই গ্রন্থটি আমাদের সোনালি ইতিহাসের এক বর্ণিল অধ্যায় নিয়ে রচিত। অ্যা জার্নি টু আওয়ার গোল্ডেন হিস্টোরি। বইটি পড়লে আমরা জানতে পারব আমাদের সোনালি ইতিহাস সম্পর্কে। জানতে পারব যেদিন থেকে

মুসলিম পরিচয় বাদ দিয়ে ভৌগোলিক পরিচয়ে পরিচিত শুরু করেছিল সেদিন থেকেই তাদের অধঃপতন শুরু হয়েছিল। তাই বইটি অধ্যয়ন করলে মুসলিম হিসেবে গর্বে আপনার বুকের ছাতি ফুলে উঠবে। মহান আল্লাহ্ তাআলাকে লাখো কোটি শুকরিয়া জানাবেন আপনাকে মুসলিম হিসেবে সৃষ্টি করার জন্য।

এই গ্রন্থের রচয়িতা 'ড. আলি মুহাম্মদ সাল্লাবি' মুসলিমবিশ্বে একজন সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি। যিনি সমসাময়িক প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অকৃপণভাবে তার কলম চালিয়েছেন। তার অসামান্য কীর্তি এই গ্রন্থটি। ড. সাল্লাবি একপেশেভাবে শুধু ইতিহাস বর্ণনা করে যাননি, এর পাশাপাশি তিনি শাসকদের চারিত্রিক গুণাবলি, তাদের ধর্ম, বিশ্বাস এবং মতামতের কথাও সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন। এ পদ্ধতি অবলম্বন করতে গিয়ে তিনি পশ্চিমা ওরিয়েন্টালিস্টদের দ্বারা প্রভাবিত সমসাময়িক অনেক লেখকদের সমালোচনার পাত্রে পরিণত হয়েছিলেন। অবশ্য তিনি তার ইতিহাস বর্ণনার এই অভিনবত্বের যৌক্তিকতা বইয়ের শুরুতে থাকা নাতিদীর্ঘ ভূমিকায় তুলে ধরেছেন। যার মাধ্যমে আশা করি চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের চোখের ওপর থেকে পর্দা সরে গিয়ে এই বিষয়ে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি তাদের সামনে উদ্ভাসিত হবে। এই পদ্ধতি অবলম্বনের ফলে এই বই থেকে আমরা ইতিহাস জানার পাশাপাশি আমাদের পূর্ববর্তী শাসকগণের চারিত্রিক সুষমা এবং তাদের খোদাভীরুতা ও ধার্মিকতা থেকে শিক্ষা লাভ করতে পারব। কেননা, ইতিহাসের জন্মই হয়েছে শিক্ষা লাভ করার জন্য। আল্লাহ তাআলা আমাদের তাওফিক দান করুন।

অনুবাদের ক্ষেত্রে আমি একেবারেই কাঁচা হাতের এক আনাড়ি। তার ওপর ড. আলি মুহাম্মদ সাল্লাবিরমতো একজন খ্যাতিমান লেখকের বইয়ের অনুবাদ আমার জন্য খুবই কষ্টসাধ্য ও চ্যালেঞ্জের বিষয় ছিল। নিজের অযোগ্যতার কথা চিন্তা করে হতোদ্যম না হয়ে আমি আল্লাহর দয়ার ওপর ভরসা করে বইটির ভাষান্তরের কাজ শুরু করে দিই। অনুবাদের ভাষা প্রাঞ্জল রাখতে আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি। ভাবানুবাদ পরিহার করে লেখকের মূল বর্ণনাভঙ্গির যতটা সম্ভব কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করেছি। তবুও নতুন অনুবাদক ও একজন মানুষ হিসেবে আমার ভুল হওয়াটাই স্বাভাবিক। বিশেষকরে বিভিন্ন জায়গা ও ব্যক্তির নামের সঠিক উচ্চারণ উদ্ধারে কোথাও কোথাও ত্রুটি থেকে যাওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। এমন কিছু হয়ে থাকলে আমি আশাবাদী, সম্মানিত পাঠক ভুলগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং বিষয়টি আমাদের জানাবেন। আমরা পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে নেব ইনশাআল্লাহ।

যখন থেকে বই পড়তে শুরু করেছি তখন থেকেই কোনো বইয়ের মলাটে ছাপার অক্ষরে নিজের নাম দেখার স্বপ্নও বুনতে শুরু করে দিয়েছিলাম। সেই স্বপ্নের বৃক্ষে যিনি পরিচর্যার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি হলেন আমার সম্মানিত উস্তাদ মাওলানা আহসান ইলিয়াস সাহেব। আল্লাহ তাআলা তাকে হায়াতে তাইয়িবা দান করুন। স্বপ্নপূরণের এ মুহূর্তে এসে আমি কৃতজ্ঞচিত্রে স্মরণ করছি সেই অমায়িক এবং মহৎ হৃদয়ের ব্যক্তিত্বকে। এর সাথে কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রদ্ধেয় বড়ভাই সালমান মোহাম্মদকে। তিনি আমার ওপর যতটা বিশ্বাস রেখেছিলেন ততটা বিশ্বাস আমার নিজেরই ছিল না। আল্লাহ তাআলাকে তাকে উত্তম প্রতিদান করুন।

কৃতজ্ঞাতা জানাই শ্রদ্ধেয় আবদুল্লাহ আল মাসউদ ভাইয়ের প্রতি, যিনি সম্পাদনার দাঁড়িপাল্লায় বসিয়ে অধমের লেখাকে পাঠকের কাছে পরিবেশনার যোগ্য করে তুলেছেন। আল্লাহ তাকে জাজায়ে খায়ের দান করুন। তার মাধ্যমে উম্মাহর প্রভূত কল্যান দান করুন।

কৃতজ্ঞতা জানাই ***মুহাম্মদ পাবলিকেশন***-এর স্বত্বাধিকারী লেখক, অনুবাদক শ্রদ্ধেয় মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান ভাইয়ের প্রতি, যিনি আমার মতো নবীন এবং নিতান্ত অনভিজ্ঞ অভাজনের প্রতি আস্থা রেখে স্বপ্নপূরণের দুয়ার উন্মোচন করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাকে এবং মুহাম্মদ পাবলিকেশনকে দ্বীনের জন্য কবুল করে নিন।

সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক সুমহান আল্লাহ তাআলার জন্য।

—মাহদি হাসান

লেখকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি। তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। তাঁর কাছেই ক্ষমা চাই। আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে আমাদের কুপ্রবৃত্তির অনিষ্ট হতে এবং আমাদের মন্দ-কর্ম হতে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আল্লাহ যাকে সুপথ দেখান তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারবে না। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ সুপথে আনতে পারবে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, একমাত্র আল্লাহ তাআলাই আমার প্রভু। তাঁর কোনো শরিক নেই। সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা এবং রাসুল।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔

{হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় করো এবং তোমরা প্রকৃত মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।} [সুরা আল ইমরান, আয়াত : ২০১]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔

{হে মানবসমাজ, তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর তাদের দুজন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী বিস্তার করেছেন। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচনা করে থাক এবং আত্মীয়-স্বজনদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করো। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন।} [সুরা নিসা, আয়াত : ১]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ـ

(হে মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে।) [আহজাব, আয়াত : ৭০, ৭১]

হে প্রভু, আপনার প্রশংসা করছি। যেমনটি আপনার বড়ত্ব ও মহত্বের সাথে সমীচীন এবং আপনি সন্তুষ্ট হওয়ার আগ পর্যন্ত আর আপনি সন্তুষ্ট হওয়ার পর সকল প্রশংসা আপনারই জন্য।

اَلدَّوْلَةُ الْعُثْمَانِيَّةُ عَوَامِلُ النُّهُوْضِ وَ اَسْبَابُ السُّقُوْطِ ـ[১]

নামক বইটি প্রকাশ পেলে লোকেরা এটা সাদরে গ্রহণ করে নেয়। বিপুল পরিমাণ লোকের কাছে বইটি সমাদৃত হয়। বইটি সম্পর্কে আমার কাছে অনেক প্রশংসনীয় মন্তব্য আসে। বিভিন্ন এলাকার পাঠকদের এক বিরাট সমষ্টি মুহাম্মদ আল ফাতিহ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ একটি বইয়ের প্রয়োজনবোধ করেন। প্রকাশকও ব্যাপারটি উপলব্ধি করেন। তাই আমরা এই প্রকল্প বাস্তবায়নে কাজ শুরু করে দিই। এই বইটির উৎস হচ্ছে— اَلدَّوْلَةُ الْعُثْمَانِيَّةُ عَوَامِلُ النُّهُوْضِ وَ اَسْبَابُ السُّقُوْطِ ـ বইটি। যদি আল্লাহ তাআলা সময় এবং বয়সে বরকত দান করেন এবং পথ সহজ করে দেন, তাহলে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে উম্মাহর এক মহানায়কের জীবনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় আবারও পুনরুজ্জীবিত হবে। আমাদের স্বর্ণালী ইতিহাসে যে মহানায়কের ছিল বিরাট ভূমিকা।

এই বইটি মুহাম্মদ আল-ফাতিহর কথা বলবে, যিনি ছিলেন কুসতানতিনিয়া বিজেতা এবং রোমের পরাক্রমশালী শাসক। আরও বলবে তাঁর পিতৃপুরুষদের কথা, যারা সারা জীবন ইসলামকে আঁকড়ে ধরে বেঁচেছিলেন। আর মৃত্যুবরণ করেছেন আল্লাহর কালিমা উড্ডীন করার পথে। বইটি ইনসাফের সাথে তাদের বিবৃতি প্রদান করবে। তাই পাঠকের সামনে তুলে ধরবে প্রথম উসমান, উরখান, প্রথম মুরাদ, প্রথম বায়েজিদ, মুহাম্মদ জালবি, দ্বিতীয় মুরাদ এবং

১. *উসমানি সাম্রাজ্য এবং তার উত্থান-পতনের কারণ*

মুহাম্মদ আল ফাতিহের জীবনগাঁথা। তুলে ধরবে তাদের গুণাগুণ, দোষত্রুটি। বলবে সেই রূপরেখার কথা, যে রূপরেখায় তারা নিজেদের জীবনকে পরিচালিত করেছেন।

বলবে—তারা রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পথে আল্লাহ তাআলার নির্দেশিত পন্থার সাথে আরও কী কী পন্থা অবলম্বন করেছেন। যেমন বিভিন্ন উপায়-উপকরণ গ্রহণের পন্থা, মনোবৃত্তি পরিবর্তনের পন্থা, প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত পন্থা এবং দুর্যোগ মোকাবেলার পন্থা প্রভৃতি। সেই সাথে এ কথাও বলবে, কীভাবে প্রথমদিকের শাসকগণ ক্ষমতার শর্তাবলি বাস্তবায়ন করেছিলেন, কীভাবে তারা মৌলিক এবং নৈতিক উপকরণগুলো গ্রহণ করেছিলেন, আর কুসতানতিনিয়ার বিজয় ছিল ক্রমবর্ধমান চেষ্টা-সাধনার ফল, কাল, যুগ এবং সময়ের পরিক্রমায় তাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন আলিম, ফকিহ এবং শাসকগণ। এসব কিছু জানা যাবে বইটি থেকে।

বইটি পাঠকের কাছে আরও বর্ণনা করবে, সুলতান মুহাম্মদ আল ফাতিহের সময়ে উসমানি সাম্রাজ্যের উত্থান ছড়িয়ে পড়েছিল দিগ-দিগন্তে, তখন বিশ্বজুড়ে ছিল উসমানি সালতানাতের চর্চা। তৎকালীন বিশ্বের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সমরাঙ্গণ—তথা সর্বক্ষেত্রে উসমানি সালতানাতের আলোচনা ছিল সবার শীর্ষে।

বইটি থেকে আরও জানা যাবে ক্ষমতায়নের গুণাবলি। শাসকদের মধ্যে যে গুণাবলি থাকা একেবারে অপরিহার্য; যেগুলো হারিয়ে গেলে ক্ষমতাও হারিয়ে যাবে।

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ـ

(পূর্ববর্তী লোকদের কাহিনিতে বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে শিক্ষণীয় বিষয়, এটা কোনো মনগড়া গল্প নয়, বরং তাদের পূর্বেকার কিতাবের সত্যায়নকারী এবং প্রতিটি বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ। আর যারা ইমান আনে তাদের জন্য হিদায়াত এবং রহমতস্বরূপ।) [সুরা ইউসুফ, আয়াত : ১১১]

এই বই থেকে পাঠক আরও জানবেন, বিভিন্ন জাতি-উপজাতি, গোত্র-সমাজ এবং রাষ্ট্র বিনির্মাণে আল্লাহ তাআলার নির্দেশিত পথ ও পদ্ধতিসমূহ সম্পর্কে। সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহের জামানায় উসমানি সালতানাতে আল্লাহ তাআলার শরিয়তের বাস্তবায়নে কী প্রতিফলন ঘটেছিল—তা সুস্পষ্ট হবে। পাঠককে আল্লাহ তাআলার কিতাব এবং তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত সম্পর্কে চিন্তা করার আহ্বান জানাবে; যাতে তারা গোত্র,

জাতি, এবং রাষ্ট্রগঠনের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে এবং এই চিন্তা-চেতনার মাধ্যমেই বান্দা আল্লাহর নির্দেশিত পন্থার প্রভাবে তার নিজস্ব এবং বৈশ্বিক আসল পরিচয় লাভ করবে। আর আল্লাহ তাআলার কিতাবের মধ্যে সমাজ, জাতি, রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় নিয়মকানুন, রীতিনীতি বিস্তৃত হয়ে আছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ـ

(আল্লাহ তোমাদের বলে দিতে চান এবং দেখিয়ে দিতে চান, তোমাদের পূর্ববর্তীদের নিয়মনীতিসমূহ এবং তোমাদের তওবা কবুল করতে চান। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ এবং সবচেয়ে প্রজ্ঞাবান।) [সুরা নিসা, আয়াত : ২৬]

বিভিন্ন স্থানে সফর করে, ইতিহাস এবং জীবনী অধ্যয়ন করে আগেকার লোকদের নিদর্শন তালাশের শিক্ষা আমরা কুরআন থেকেই পেয়েছি। আল্লাহ তাআলা বলেন—

قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ۝ هَٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ـ

(তোমাদের পূর্বে অনেক রীতি-রেওয়াজ অতিবাহিত হয়েছে, তাই তোমরা জমিনে সফর করো এবং দেখ, কেমন ছিল মিথ্যাবাদীদের পরিণাম; এটা সাধারণ লোকদের জন্য শিক্ষা এবং খোদাভীরুদের জন্য হিদায়াত ও উপদেশস্বরূপ।) [সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৩৭, ১৩৮]

আর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে পূর্বের রীতি-রেওয়াজ সম্পর্কে জানতেও কুরআন পথনির্দেশ করেছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَٰتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ ۝ فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ ـ

(আপনি বলে দিন, চেয়ে দেখো আসমানসমূহে ও জমিনে কি রয়েছে। আর কোনো নিদর্শন এবং কোনো ভীতিপ্রদর্শনই কোনো কাজে আসে না, সেসব

লোকের জন্য—যারা মান্য করে না। সুতরাং এখন আর এমন কিছু নেই, যার অপেক্ষা করবে; কিন্তু সেসব দিনের মতোই দিন, যা অতীত হয়ে গেছে এর পূর্বে। আপনি বলুন, এখন পথ দেখো; আমিও তোমাদের সাথে পথচেয়ে রইলাম।) [সূরা ইউনুস, আয়াত : ১০১,১০২]

সুনানে ইলাহি তথা আল্লাহ তাআলার নির্দেশিত পন্থা ও পদ্ধতির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, এটি সর্বপ্রাচীন। এটির কোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধন হবে না। এটির বিরোধিতা করা যাবে না। আর বিরোধিতা করলে কোনো লাভও হবে না। সীমালঙ্ঘনকারীরা এর মাধ্যমে উপকার লাভ করতে পারবে না, বরং এর মাধ্যমে খোদাভীরুরা উপদেশ গ্রহণ করবে। আর তা নেককার এবং পাপী উভয়ের ওপরেই প্রয়োগ হবে।

এই বইয়ে আমি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছি সুলতান মুহাম্মদ ফাতিহের জমানায় আল্লাহ তাআলার শরিয়ত প্রতিষ্ঠার ফলাফলের ওপর। তাই আমি সেই ফলাফলগুলোর বর্ণনা দিয়েছি। যেমন—ক্ষমতা ও খিলাফত, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা, সাহায্য ও বিজয়, সম্মান ও সমৃদ্ধি, উত্তম বিষয়াদির প্রসার এবং মন্দের নিঃসৃতি।

আরও আলোচনা করেছি সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহের গুণাবলি এবং সভ্যতামূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে। মৃত্যুর বিছানায় শুয়ে তিনি তার পুত্রকে যে অসিয়ত করেছিলেন আমি তা উল্লেখ করেছি। যে অসিয়ত পরিপূর্ণ সততার সাথে তার জীবন চলার পথের নীতির কথা ব্যক্ত করেছে। আরও ব্যক্ত করেছে তার দৃঢ়তা এবং নিরাপত্তার উপাদানসমূহের কথা। তিনি চাইতেন তার পরবর্তী সুলতানগণও যাতে এ নীতিই মেনে চলেন। তাই আমি অসিয়তগুলো ব্যাখ্যা করেছি এবং তার মৌলিক নীতিমালাসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। আমি বিশ্বাস করি, উম্মাহর অভিভাবক এবং নেতৃবৃন্দের জন্য এই অসিয়তনামা পাঠ করা, উপলব্ধি করা এবং তা বাস্তবায়ন করা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহের সাথে সম্পৃক্ত সন্দেহমূলক বিষয়গুলোও আমি উল্লেখ করে দিয়েছি। যেমন, *তারিখুল উসমানিয়্যিনাল আতরাক* গ্রন্থের লেখক ইংরেজ ইতিহাসবিদ এডওয়ার্ড শিফার্ড ক্রুইসি কিছু অমূলক সন্দেহের উদ্ভাবন করেছেন। তিনি কুসতানতিনিয়া বিজয়ের চিত্রকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করেছেন এবং ইসলামের সম্ভ্রান্ত বিজয়ের ওপর হিংসা ও বিদ্বেষবশত সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহকে অনেক মন্দ বিশেষণে বিশেষায়িত করেছেন। ১৯৬০ সালে আমেরিকান প্রকাশনাগুলো ইসলামের বিরুদ্ধে ক্রুসেডীয় ঘৃণা এবং বিদ্বেষের ইতিহাস সংরক্ষণের উদ্যোগ নেয়। তারা ধারণা করেছিল, সুলতান

মুহাম্মদ আল-ফাতিহ কুসতানতিনিয়ার খ্রিষ্টানদের গোলাম বানিয়ে তাদেরকে আদ্রিয়ানোপলের গোলাম বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দিয়েছে। আমি এ সমস্ত অমূলক সন্দেহগুলো মূল থেকে উচ্ছেদ করে দিয়েছি এবং নিরপেক্ষ ও বাস্তবিক ইতিহাস তুলে ধরে তার দলিল এবং অকাট্য প্রমাণসমূহ উল্লেখ করেছি, বর্ণনায় তুলে ধরেছি—সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ কুসতানতিনিয়াবাসীর সাথে খুবই দয়াদ্র এবং কোমল আচরণ করেছিলেন। তার সৈন্যদেরকে বন্দীদের সাথে উত্তম ব্যবহার এবং কোমলতার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সুলতান তার নিজস্ব সম্পদ থেকে বহু সংখ্যক বন্দীর মুক্তিপণ প্রদান করেন। তিনি ধর্মীয় পণ্ডিতদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের ভয় দূর করেছেন এবং তাদেরকে স্বীয় ধর্মবিশ্বাস এবং ইবাদতগাহের ব্যাপারে নিরাপত্তা দিয়েছেন।

বইটিতে আরও বর্ণনা করেছি, সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ কুসতানতিনিয়ার খ্রিষ্টানদের সাথে যে সদাচারণ করেছিলেন তা অন্য কেউ করেনি। এ ছিল ইসলামের মহৎ শিক্ষা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ এবং তার পরবর্তী খুলাফায়ে রাশেদিনের পদাঙ্ক অনুসরণের ফল। অনুরূপ জিম্মিদের সাথে তিনি যে আচরণ করেছিলেন তাতেও ফুটে উঠেছে তাদের অনুসরণের ছায়া। ইতিহাসের পাতা শত্রুর সাথে সুলতান ফাতিহের সদাচারণের ঘটনাগুলোর বর্ণনাতে পরিপূর্ণ।

উসমানিগণের অবদান অস্বীকার করবে কে? তাদের মাধ্যমেই দক্ষিণ আফ্রিকা অঞ্চলে মুসলমানদের ভিত মজবুত হয়েছিল। সেদিন স্পেন এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের যোদ্ধারা তাদের ওপর আক্রমণ করেছিল। তাদের নেতৃত্বে ছিলেন কার্ডিনাল কামিন্স। তারা প্রতিরোধ করে দক্ষিণ আফ্রিকা অঞ্চলে উসমানি সাম্রাজ্যের মাধ্যমে মুসলমানদের ভিত মজবুতকরণে বাঁধাপ্রদান করে। উসমানি সাম্রাজ্য তাদের ধর্মীয় ভ্রাতৃত্বের সমর্থনে দ্রুততার সাথে এগিয়ে এসেছিল। এ সময়েই মহান সেনাপতি, বীর মুজাহিদ খাইরুদ্দিন বারবারোসার আত্মপ্রকাশ ঘটে। তিনি ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করে দক্ষিণ আফ্রিকার তীরবর্তী অঞ্চলকে খ্রিষ্টান যোদ্ধামুক্ত করেছিলেন। অবশেষে তিনি আরেকবার সে ভূখণ্ডে ইসলামকে বিজয়ী করেন এবং সেখানকার মুসলমানদেরকে নিশ্চিত অনিষ্টের হাত থেকে রক্ষা করেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কুসতানতিনিয়া বিজয়ের সুসংবাদ দিয়েছিলেন—তা সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ ব্যতীত অন্য কেউ বিজয় করতে পারেনি। তিনি খুবই সুপরিকল্পিত একটি রূপরেখা প্রণয়ন করেন, সৈন্যসংখ্যায় প্রাচুর্য ঘটান এবং দ্রুততার সাথে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে মনোযোগী হন। এ কথা প্রমাণিত হয়, যেদিন তিনি জাহাজগুলোকে স্থলপথে

চালিত করে সেগুলোকে বাইজেন্টাইনদের মোকাবেলা করার জন্য সমুদ্রে অবতরণ করান; যা বাইজেন্টাইনদের নৌবহরকে নিষ্ক্রীয় করায় এবং তাদের পরাজয়ে ভূমিকা রাখে। এরপর কুসতানতিনিয়া বিজিত হয়—যা পরবর্তী সময়ে উসমানি খিলাফতের রাজধানীতে রূপান্তরিত হয়। তার নাম রাখা হয় ইসলাম্বুল অথবা ইস্তাম্বুল। আমরা সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহের মতো এমন শাসকের ইতিহাস কেন ভুলে যাব—যিনি তার দিনরাত কাটিয়েছেন যুদ্ধের অশ্বে আরোহণ করে এবং যুদ্ধের তাঁবুতে অবস্থান করে। শহরের প্রাসাদে শুয়ে শুয়ে বিশ্রাম এবং নিদ্রাসুখের সাথে তার কখনো পরিচয় লাভ হয়নি![২]

আমি আমার আগের গ্রন্থ *আদদাওলাতুল উসমানিয়্যাতু আওয়ামিলুন নুহুযি ওয়া আসবাবুস সুকুত*-এর মধ্যে উসমানি সাম্রাজ্য, তাদের অবদান এবং তাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগসমূহ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। তবে এই গ্রন্থে সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহের জীবনী এবং তার সময়ে সাম্রাজ্যের উত্থানের কারণসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে।

পশ্চিমা নীতিমালায় প্রভাবিত কতক বুদ্ধিজীবী প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। আমি *সিলাসিলাতু সফহাতিম মিনাত তারিখিল ইসলামি ফিশশিমালিল আফ্রিকি* গ্রন্থে তাদের সমালোচনাসহ তাদের বর্ণনা দিয়েছি। তারা বলেছিল, ইতিহাসে ধর্মবিশ্বাসের অনুপ্রবেশের কী প্রয়োজন? ইতিহাসের সাথে নেতৃবৃন্দের গুণাবলির কী সম্পর্ক? শরিয়ত প্রতিষ্ঠা হলো কি হলো না—এর সাথে ইতিহাসের কী সম্পৃক্ততা?

এই প্রশ্নের উত্তরে আমি আল্লাহ তাআলার কাছে তাওফিক প্রার্থনা করে বলব—ইসলামি ইতিহাস এবং তার ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে লেখালেখির নীতিমালা মৌলিকভাবে ইসলামি ভাবনার ওপর নির্ভরশীল। ইসলামি আকিদা এবং তার চাহিদাসমূহই হবে তার নীতিমালা প্রণয়নের, ঘটনাপ্রবাহের ব্যাখ্যা করার এবং তার ওপরে কোনো সিদ্ধান্ত দেওয়ার মূলস্তম্ভ। ড. আকরাম জিয়া আল উমারি এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, ইতিহাসের ইসলামি ব্যাখ্যা জগৎ, জীবন এবং মানুষের ইসলামি ভাবনা হতে উদ্ভূত। আল্লাহ তাআলার প্রতি, তার কিতাবসমূহ এবং রাসুলগণের প্রতি, আখেরাত দিবসের প্রতি এবং তাকদিরের ভালো-মন্দ সব আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে—এ কথা

---

[২] *তারিখুনা বাইনা তাযওয়িরিল আদায়ি ওয়া গাফলাতিল আবনায়ি*, ইউসুফ আল আযম, পৃষ্ঠা : ১৭৪-১৭৭।

বিশ্বাস করার মাধ্যমেই তা প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। তা কখনো ইসলামি আকিদা-বিশ্বাসের গণ্ডি থেকে বের হবে না। এভাবে তা পূর্ববর্তী ইসলামি সমাজের চলার পথের নীতিমালার ওপর নির্ভরশীল—যা ইসলামি ইতিহাসের কার্যক্রমকে অন্যান্য আন্তর্জাতিক ইসলামি ইতিহাসের তুলনায় বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। কেননা, তার মধ্যে আল্লাহ তাআলার ঐশী বাণীর প্রভাব রয়েছে।[৩]

এজন্যই ইতিহাস বর্ণনায় শরয়ি উৎসসমূহের সাহায্য নেওয়া উচিত, যাতে যেখান থেকে ইসলামের বিস্তার হয়েছে সে সমাজের চলার নীতি জানা যায় এবং তা যেন শরিয়তের নির্দেশনা অনুযায়ী হয়। তার জীবন ও ভাবনা শরিয়ত মোতাবেক হয়। শরিয়তের শিক্ষা এবং আদেশ-নিষেধসমূহ তার অধিকাংশ কাজেই আল্লাহ তাআলার দিকে আহ্বান করার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করেছে। এভাবে আল্লাহ তাআলার রাস্তায় জিহাদ করা, সুশিক্ষা দেওয়া, একটি প্রশাসনিক ও সামাজিক ভিত্তি সম্বলিত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা এবং ইসলামি সমাজের সাথে পরস্পরের সম্পর্ক স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করেছে।

আমাদের ইসলামি ইতিহাসের কার্যক্রম যাতে সঠিক এবং বাস্তবিক হয় সেজন্য আমাদের আবশ্যক হলো, ওই সমস্ত কারণ সম্পর্কে জানা এবং অনুধাবন করা, যার মাধ্যমে ইসলামি সমাজ গঠিত হয়েছে এবং ইসলামি সমাজের ভাবনা ও সভ্যতা বিনির্মাণে যা অবদান রেখেছে। আমাদের জন্য আরও আবশ্যক হচ্ছে, এসব ইতিহাসকে শরয়ি আদেশ ও নিষেধের দাঁড়িপাল্লায় পরিমাপ করা। তা থেকে কতটুকু এ সমস্ত আদেশ এবং চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, কতটুকু তা থেকে বিচ্যুত, যাতে আমরা মানবসমাজে ইসলাম-সৃষ্ট প্রভাবের মূল সম্পর্কে জানতে পারি। আল্লাহ তাআলার শরিয়ত থেকে দূরে থাকা এবং তার বিকৃতির ফলে মানবসমাজের কী ক্ষতি হয়েছিল এবং তার কী মূল্য চুকাতে হয়েছিল—তা সম্পর্কেও যেন জানতে পারি। মানবসমাজের প্রতি আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ এবং দয়ার কথাও যেন উপলব্ধি করতে পারি। কেননা, তিনি তাদেরকে এই ধর্মের মাধ্যমে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে, অত্যাচার থেকে ন্যায়ের দিকে, পার্থিব সংকট থেকে ইহকালীন এবং পরকালীন প্রশস্ততার দিকে, দুর্ভাগ্য থেকে সৌভাগ্যের দিকে এবং ভয়-ভীতি, অস্থিরতা থেকে ইমানি প্রশান্তি এবং নিরাপত্তার দিকে চালিত করেছেন।

---

[৩] *ইয়াদাতু কিতাবাতি সাদরিত তারিখিল ইসলামি*, ড. আকরাম জিয়া আল-উমারি, পৃষ্ঠা : ৩।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

الٓرٰ ۚ كِتٰبٌ أَنزَلْنٰهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلٰى صِرٰطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ـ

{আলিফ-লাম-রা; এটি একটি গ্রন্থ, যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি—যাতে আপনি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন, পরাক্রান্ত, প্রশংসার যোগ্য পালনকর্তার নির্দেশে তাঁরই পথের দিকে।} [সূরা ইবরাহিম, আয়াত : ১]

সুতরাং, ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে ইসলামি রীতি হচ্ছে, ইসলামের মূলনীতিসমূহ এবং উৎসধারা হতে তার দৃষ্টিভঙ্গি এবং নীতি চয়ন করা। অন্যান্য ইতিহাসের রীতির সাথে এখানেই ইসলামি ইতিহাসের পার্থক্য। তাই ইতিহাসের ঘটনাসমূহের বিবৃতির ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই তা শুধু একপেশে ব্যাখাই নয়; বরং এর বাইরে উন্নত ইমানের বৈশিষ্ট্যাবলিও তাতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।[৪]

ড. আকরাম আল উমারি এ ক্ষেত্রে আরও সংযুক্ত করেন, এটা কোনো মৌলিক ব্যাখ্যা নয়—যা মানব-ইতিহাসের বিভিন্ন নিদর্শন এবং মৌলিক উপাদান ইত্যাদির বর্ণনাতেই সীমাবদ্ধ থাকে। যেমন, মার্ক্সবাদী ভাবধারার ইতিহাসে ফসল উৎপাদনের যন্ত্রপাতির বর্ণনা পাওয়া যায়। পশ্চিমা ভাবধারার ইতিহাসে জলবায়ু, ভৌগোলিক এবং অর্থনীতির মতো বাইরের পরিবেশের বর্ণনা থাকে, বরং ইসলামি ইতিহাস আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার গণ্ডিতে আবদ্ধ থেকে ঐতিহাসিক এবং সামাজিক ব্যাখার মাধ্যমে মানবসমাজের ভূমিকা এবং তাদের দায়িত্বকে স্পষ্ট করে।[৫]

ইসলামি ইতিহাস লিপিবদ্ধকারী এবং ব্যাখ্যাকারীদের জন্য আবশ্যকীয় কিছু শর্ত হচ্ছে, শরয়ি উৎসসমূহের সাহায্য নেওয়া, ইসলামি আকিদা উপলব্ধি করা এবং তা আঁকড়ে ধরা; সেইসাথে যারা তা আঁকড়ে ধরে তাদের ওপর প্রভাবিত আদর্শ লালন করা। যখন এর কোনো একটিতে বিচ্যুতি ঘটবে তখন তার গবেষণা হবে অসম্পূর্ণ, মেকি এবং গবেষকের সাথে সম্পৃক্ত সামাজিক এবং চিন্তাধারাগত অবস্থা দ্বারা প্রভাবিত। এ জন্যই সমসাময়িক অনেকের গ্রন্থের মধ্যে অনেক ভুল হয়েছে। কিছু ভুলের জন্য দায়ী হলো শরয়ি উৎসের

[৪] *সফহাতুম মিন তারিখি লিবিয়া আল ইসলামি*, ড. আলি মুহাম্মদ মুহাম্মদ সাল্লাবি, পৃষ্ঠা : ৫৮, ৫৯।
[৫] *ইয়াদাতু কিতাবাতি সদরিত তারিখিল ইসলামি*, ড. আকরাম জিয়া আল-উমারি, পৃষ্ঠা : ৩।

দিকে তাদের প্রত্যাবর্তনের সীমাবদ্ধতা। আর কিছু ভুলের জন্য দায়ী হচ্ছে তাদের চিন্তা-চেতনার অস্পষ্টতা এবং ইউরোপের বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেড সম্পর্কে তাদের স্পষ্ট ধারণা না থাকা।

ইতিহাসের বর্ণনার ক্ষেত্রে আমি সেই নীতিই অবলম্বন করেছি যেভাবে কুরআনে ঘটনাসমূহের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এ জন্য আমি নেতা এবং শীর্ষস্থানীয়দের গুণ বর্ণনা করা, আকিদাগত মাসআলা বর্ণনা করা এবং যে সমস্ত মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং জাতি উজ্জীবিত হয়েছে, সেগুলো স্পষ্ট করার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেছি। এ ব্যাপারে আমি কুরআনে কারিমে নবি দাউদ আলাইহিস সালামের আলোচনা থেকে একটি উদাহরণ পেশ করব।

কুরআনে কারিমে নবি দাউদ আলাইহিস সালামের আলোচনা সম্পর্কে যিনি গবেষণা করবেন তিনি একজন মুমিন শাসকের গুণাবলি সম্বন্ধে পরিচয় লাভ করবেন। যাকে আল্লাহ তাআলা ক্ষমতা দান করেছিলেন। এতেই একজন সৎ শাসকের জন্য দুনিয়া এবং আখেরাতের পরিপূর্ণ সৌভাগ্য নিশ্চিত হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ ـ

(তারা যা বলে তাতে আপনি সবর করুন এবং আমার শক্তিশালী বান্দা দাউদকে স্মরণ করুন। সে ছিল আমার প্রতি প্রত্যাবর্তনশীল।) [সুরা সোয়াদ, আয়াত : ১৭]

উক্ত আয়াতে তার কিছু গুণ উল্লিখিত রয়েছে, যথা—

[১] সবর তথা ধৈর্য : আল্লাহ তাআলা আমাদের নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তার ক্ষমতার মহত্ত্বের ভিত্তিতে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের ওপর ধৈর্যধারণ করতে আদেশ দিয়েছেন।

[২] উবুদিয়্যাত : আল্লাহ তায়ালা তাকে 'عَبْدَنَا' বা 'আমাদের বান্দা' বলে বিশেষায়িত করেছেন। আল্লাহ তায়ালা নিজের সম্মান এবং বড়ত্ব বোঝাতে বহুবচন এর শব্দ ব্যবহার করেছেন। তিনি যখন কাউকে বান্দা বলে সম্বোধন করেন, তখন এর মাধ্যমে তাকে চূড়ান্ত সম্মান করা হয়। যেমন—আল্লাহ তায়ালা মেরাজের রাতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বান্দা বলে সম্বোধন করেছেন। তিনি বলেছেন—

سُبْحٰنَ الَّذِیْٓ اَسْرٰی بِعَبْدِهٖ ـ

(পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাতে ভ্রমণ করিয়েছিলেন।) [সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ১]

[৩] 'ذَا الْأَيْد' শব্দের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তাকে আনুগত্য আদায়ের জন্য এবং গোনাহ থেকে বিরত থাকার জন্য শক্তি প্রদান করার কথা ব্যক্ত করেছেন।

[৪] 'أَوَّابٌ' শব্দের মাধ্যমে সকল কাজে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করার কথা ব্যক্ত করেছেন।

তিনি যে আল্লাহ তাআলার পরিপূর্ণ পরিচয় লাভ করেছেন তার দলিল হলো, আয়াতে তাকে আনুগত্যের ওপর শক্তিলাভ এবং আল্লাহ তাআলার দিকে প্রত্যাবর্তন করার গুণে গুণান্বিত করা হয়েছে। এটি তাকে ঐশী পদ্ধতিতে আল্লাহ তাআলার ইবাদাতের যোগ্য বানিয়েছে।

আল্লাহ তাআলা দাউদ আলাইহিস সালামের গুণাবলি বর্ণনা করেছেন। কুরআনে কারিমে দাউদ আলাইহিস সালামের ওপর আসা বিপদ এবং ফিতনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَ هَلْ اَتٰىكَ نَبَؤُا الْخَصْمِ اِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ـ اِذْ دَخَلُوْا عَلٰى دَاوٗدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوْا لَا تَخَفْ خَصْمٰنِ بَغٰى بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَ لَا تُشْطِطْ وَ اهْدِنَآ اِلٰى سَوَآءِ الصِّرَاطِ ـ اِنَّ هٰذَآ اَخِیْ لَهٗ تِسْعٌ وَّ تِسْعُوْنَ نَعْجَةً وَّلِیَ نَعْجَةٌ وَّاحِدَةٌ فَقَالَ اَكْفِلْنِیْهَا وَ عَزَّنِیْ فِی الْخِطَابِ ـ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ اِلٰى نِعَاجِهٖ وَ اِنَّ كَثِیْرًا مِّنَ الْخُلَطَآءِ لَیَبْغِیْ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ قَلِیْلٌ مَّا هُمْ وَ ظَنَّ دَاوٗدُ اَنَّمَا فَتَنّٰهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ وَ خَرَّ رَاكِعًا وَّ اَنَابَ ـ

(আপনার কাছে দাবিদারদের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে? যখন তারা প্রাচীর ডিঙিয়ে ইবাদতখানায় প্রবেশ করেছিল। যখন তারা দাউদের কাছে অনুপ্রবেশ করল, তখন সে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। তারা বলল, ভয় করবেন না; আমরা বিবাদমান

দুটি পক্ষ, একে অপরের প্রতি বাড়াবাড়ি করেছি। অতএব, আমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করুন, অবিচার করবেন না। আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন। সে আমার ভাই, সে নিরানব্বই দুম্বার মালিক আর আমি মালিক একটি মাদী দুম্বার। তারপরও সে বলে, এটিও আমাকে দিয়ে দাও। সে কথাবার্তায় আমার ওপর বল প্রয়োগ করে। দাউদ বলল, সে তোমার দুম্বাটিকে নিজের দুম্বাগুলোর সাথে সংযুক্ত করার দাবি করে তোমার প্রতি অবিচার করেছে। শরিকদের অনেকেই একে অপরের প্রতি জুলুম করে থাকে। তবে তারা করে না, যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী ও সৎকর্ম সম্পাদনকারী। অবশ্য এমন লোকের সংখ্যা অল্প। দাউদের খেয়াল হলো যে, আমি তাকে পরীক্ষা করছি। অতঃপর সে তার পালনকর্তার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করল, সেজদায় লুটিয়ে পড়ল এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করল।) [সূরা সোয়াদ, আয়াত : ২৪]

উলামায়ে কেরাম উল্লিখিত আয়াত থেকে একটি বিশাল ফায়েদা এবং গুরুত্বপূর্ণ হুকুমের কথা উল্লেখ করেছেন। কুরআনে দাউদ আলাইহিস সালামের ওপর নিপতিত বিপদাপদের আয়াত বর্ণনা করার পর আল্লাহ তাআলা তাকে যে রাজত্ব দিয়েছেন সে কথা বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِي الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ۔

(হে দাউদ, আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি; অতএব, তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে রাজত্ব করো এবং খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না। তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি, এ কারণে যে, তারা হিসাবদিবসকে ভুলে যায়।) [সূরা ছোয়াদ, আয়াত : ২৬]

আল্লাহ তাআলা উক্ত আয়াতের মধ্যে মুসলমানদের শিক্ষাস্বরূপ শাসন এবং রাজত্বের মূলনীতিসমূহ বর্ণনা করেছেন।

[১] 'فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ' অর্থাৎ তুমি মানুষের মাঝে ইনসাফ এবং ন্যায়সঙ্গত ফায়সালা করো। আকাশ এবং জমিন যে ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটি শাসনের প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতি।

[২] 'وَ لَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى' অর্থাৎ তুমি শাসনের ক্ষেত্রে তোমার নিজের প্রবৃত্তি এবং দুনিয়াবি ভোগবিলাসের দিকে ঝুঁকবে না। কেননা, প্রবৃত্তির অনুসরণ পদস্খলনের কারণ এবং জাহান্নামের আগুনের দিকে আহ্বানকারী।

নিশ্চয়ই উক্ত আয়াতে কারিমা বর্ণনা করে দিয়েছে, মানুষের মাঝে শাসন করা একটি ধর্মীয় দায়িত্ব। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আল্লাহ তাআলার বিশেষ বিশেষ বান্দাগণ এ দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছেন। যিনি এই মহান দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তার কর্তব্য হচ্ছে সততার সাথে, প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বিরত হয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করা। সততার সাথে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য শরিয়তের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানা ও শরিয়ত-নির্দেশিত ফায়সালার পদ্ধতি এবং শরয়ি বিধানে তার অনুপ্রবেশের নিয়ম সম্পর্কে অবগতি লাভ করা আবশ্যক। এই দুটি বিষয়ের যে কোনো একটি সম্পর্কে কেউ অজ্ঞ হলে সে শাসনের যোগ্য হবে না। শাসনভার গ্রহণ করতে এগিয়ে আসা তার জন্য বৈধ হবে না। অনুরূপ আয়াতে কারিমা বর্ণনা করে দিয়েছে, শাসকের জন্য উচিত হলো প্রবৃত্তিকে পরিত্যাগ করা। এরপর আয়াতে কারিমা আমাদের জানিয়ে দিয়েছে, মুসলমানদের জীবনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আকিদাগত মাসআলা। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَ الْاَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۭ ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ۔ اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِي الْاَرْضِ ۭ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ۔ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ وَ لِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ۔

(আমি আসমান-জমিন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী কোনো কিছু অযথা সৃষ্টি করিনি। এটা কাফেরদের ধারণা। অতএব, কাফেরদের জন্যে রয়েছে দুর্ভোগ অর্থাৎ জাহান্নাম। আমি কি বিশ্বাসী ও সৎকর্মীদেরকে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাফেরদের সমতুল্য করে দেব, না খোদাভীরুদেরকে পাপাচারীদের সম্মান করে দেব? এটি একটি বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি

বরকত হিসেবে অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ লক্ষ করে এবং বুদ্ধিমানগণ যেন তা অনুধাবন করে।) [সূরা সোয়াদ, আয়াত : ২৭-২৯]

এরপর কুরআন আল্লাহ তাআলা কর্তৃক দাউদ আলাইহিস সালামকে প্রদত্ত দানের কথা বর্ণনা করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَ وَهَبْنَا لِدَاوٗدَ سُلَيْمٰنَ ؕ نِعْمَ الْعَبْدُ ؕ اِنَّهٗۤ اَوَّابٌ ۔

(আমি দাউদকে দান করেছি সুলায়মান। সে একজন উত্তম বান্দা। নিশ্চয়ই সে ছিল প্রত্যাবর্তনশীল।) [সূরা সোয়াদ, আয়াত : ৩০]

এভাবে দাউদ আলাইহিস সালাম যে অস্ত্র তৈরি করতেন তার বর্ণনাও কুরআন দিয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

وَ عَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْۢ بَاْسِكُمْ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ شٰكِرُوْنَ ۔

(আমি তাকে তোমাদের জন্যে বর্ম তৈরির শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে তা যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করে। অতএব, তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে?) [সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ৮০]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

وَ اَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ ۔ اَنِ اعْمَلْ سٰبِغٰتٍ وَّ قَدِّرْ فِى السَّرْدِ وَ اعْمَلُوْا صَالِحًا ؕ اِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۔

(আমি তার জন্য লৌহকে নরম করেছিলাম এবং তাকে আমি বলেছিলাম, প্রশস্ত বর্ম তৈরি করো, কড়াসমূহ যথাযথভাবে সংযুক্ত করো এবং সৎকর্ম সম্পাদন করো। তোমরা যা কিছু কর, আমি তা দেখি।) [সূরা সাবা, আয়াত : ১০, ১১]

নবুওয়াত এবং খিলাফতের সাথে এগুলো ছিল রাজা এবং সুলতানগণের ওপর আল্লাহ তাআলার দান। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা কর্তৃক লোহাকে সহজতর করে দেওয়া অথবা লোহার ব্যবহার শিখিয়ে দেওয়া ছিল দাউদ আলাইহিস সালামের ওপর অনেক বড় একটি নিয়ামত। কেননা, লোহা আবাদী, বসবাস এবং শিল্প ও নির্মাণকাজের মূলধাতু। নিঃসন্দেহে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা এবং সভ্যতার বিনির্মাণে এবং সেনাবাহিনীর বিজয় নিশ্চিতকরণে লোহার ভূমিকা অনস্বীকার্য।

আমি ইতিহাসের গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে কুরআনের এই নীতিই অবলম্বন করেছি। এজন্যই আমি নেতৃবৃন্দের গুণাবলি, তাদের ধর্মবিশ্বাস, তাদের অনুসৃত নীতিমালা, আল্লাহ তাআলার শরিয়ত থেকে তাদের দূরত্ব অথবা নৈকট্য এসব উল্লেখ করার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছি। এই নীতিই পশ্চিমাদের ইতিহাস লেখার নীতিমালাবিরোধী। কেননা, পশ্চিমা-ইতিহাস মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা তার পবিত্র গ্রন্থে যে নীতি দেখিয়েছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহয় আমরা যে নীতি পেয়েছি, সে নীতির বহির্গামী। তা মানুষ, জীবন এবং জগত নিয়েই সীমাবদ্ধ। পশ্চিমা নীতির দ্বারা প্রভাবিত কিছু লেখক আমাদের ইতিহাসেও পশ্চিমাদের ভ্রান্ত এবং কূটচালমূলক নীতি অবলম্বন করে থাকে। যারা সর্বদা মুসলিমদেরকে তাদের ধর্ম, বিশ্বাস-চেতনা, ইতিহাস এবং ঐতিহ্য থেকে দূরে রাখতে চায়।

আমার কাছে কতক আলোচকের জ্ঞানগর্ভ পর্যালোচনা এসে পৌঁছেছে। আমি তা থেকে উপকৃত হয়েছি। তাদের জন্য রইল কৃতজ্ঞতা ও দোয়া। আল্লাহ তাআলা যেন তাদেরকে তাওফিক এবং সুযোগ দেন। আর আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের সকলকে আমাদের দ্বীন, আকিদা এবং আমাদের সম্ভ্রান্ত ইতিহাসের সেবা করার সুযোগ দেন।

আমি উক্ত গ্রন্থটিকে ভূমিকা, দুইটি অধ্যায় এবং পরিশিষ্টে বিভক্ত করেছি।

প্রথম অধ্যায় : উসমানি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা এবং তার বিজয় অভিযানসমূহ

এর মধ্যে ছয়টি পরিচ্ছেদ রয়েছে—

প্রথম পরিচ্ছেদ : উসমানি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা উসমান

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : সুলতান উরখান ইবনে উসমান

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : সুলতান মুরাদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : সুলতান প্রথম বায়েজিদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : সুলতান প্রথম মুহাম্মদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ

দ্বিতীয় অধ্যায় : মুহাম্মদ আল-ফাতিহ এবং কুসতানতিনিয়া বিজয়

এতে সাতটি পরিচ্ছেদ রয়েছে—

প্রথম পরিচ্ছেদ : সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আক্ষরিক অর্থে কুসতানতিনিয়ার বিজয়ী শায়খ শামসুদ্দিন আক মুহাম্মদ ইবনে হামজা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলামি এবং ইউরোপবিশ্বে কুসতানতিনিয়া বিজয়ের প্রভাব

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : কুসতানতিনিয়া বিজয়ের কারণসমূহ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : মুহাম্মদ আল-ফাতিহের উল্লেখযোগ্য গুণাবলি

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : তার কিছু ঐতিহ্যবাহী কর্মকাণ্ড

সপ্তম পরিচ্ছেদ : পুত্রের প্রতি সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহের অসিয়ত। এরপর পরিশিষ্ট।

পরিশেষে আমি আল্লাহ তাআলার কাছে আশাবাদী, এটি যেন একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে একটি একনিষ্ঠ কর্ম হিসেবে গ্রহণীয় হয়। আমার লিখিত প্রত্যেকটি হরফের বিনিময়ে তিনি যেন আমাকে সাওয়াব দান করেন এবং সেগুলোকে আমার নেকির দাঁড়িপাল্লায় স্থাপন করেন। কিতাবটি পরিপূর্ণ করতে যেসব ভাইয়েরা আমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করেছেন আল্লাহ তাআলা যেন তাদেরকে যথোপযুক্ত সওয়াব দেন।

সম্মানিত পাঠকের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত কবিতার লাইনগুলো আমার পক্ষ থেকে উপহার হিসেবে রইল—

'শতাব্দীর পর শতাব্দী আমরা ছিলাম পৃথিবীর মুকুটধারী
আমাদের স্বর্গীয় পূর্বপুরুষগণ পৃথিবীকে করেছেন অবনত
আমরা রচেছি আলোর বহু গ্রন্থ
সময় ভোলেনি আমাদের, আমরাও ভুলিনি তাকে,
এমনি করেই কেটে গেল সময়
আমাদেরই আরেক জাতি এল পৃথিবীর যাত্রী হয়ে
সময় এখন প্রশ্ন করে মুসলমানরা কোথায়
বিষবেদনায় নীল হয়ে যাই আমি এবং সবাই।'

মহান প্রভুর দয়া এবং ক্ষমার মুহতাজ

—আলি মুহাম্মদ সাল্লাবি

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

উসমানি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা এবং তাদের বিজয় অভিযানসমূহ ৩৯

ভূমিকা ৪১

প্রথম পরিচ্ছেদ ৪৩

উসমানি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা উসমান ৪৩

এক. প্রথম উসমানের নেতৃত্বসুলভ উল্লেখযোগ্য গুণাবলি ৪৭

দুই. উসমানি শাসকগণ যে নীতি মেনে চলেছিলেন— ৫১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ৮৫

সুলতান উরখান ইবনে উসমান ৮৫

সুলতান উরখানের কার্যক্রমসমূহ ৮৬

এক. একটি নতুন সেনাবাহিনী গঠন ৮৬

দুই. উরখানের স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রনীতি ৯০

তিন. যে সমস্ত উপকরণ সুলতান উরখানকে তার লক্ষ্য বাস্তবায়নে সাহায্য করেছিল ৯১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ৯৫

সুলতান প্রথম মুরাদ ৯৫

সুলতান মুরাদের সময়ের উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড ৯৬

এক. মুরাদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডারদের মিত্রতা ৯৬

মারতিযা নদীর তীরে উসমানিদের বিজয় লাভের উল্লেখযোগ্য ফলাফলসমূহ ৯৬

উসমানি সাম্রাজ্য এবং খ্রিষ্টানদের মাঝে প্রথম সন্ধিচুক্তি ৯৭

কসোভোর যুদ্ধ ৯৭

দুই. সুলতান মুরাদের শাহাদাতবরণ ৯৮

সুলতান মুরাদের শেষ কথাগুলো ৯৮
কসোভোর যুদ্ধের পূর্বে সুলতান মুরাদের দোয়া ৯৮
যেভাবে তিনি তা করেছিলেন ১০০
কসোভোর যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ের ফলে যে উপকার হয়েছিল তা নিম্নরূপ— ১০৪

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ১০৫
সুলতান প্রথম বায়েজিদ ১০৫
তার কার্যক্রমসমূহ ১০৫
এক. সার্বিয়ার সাথে তার রাজনৈতিক সম্পর্ক ১০৫
দুই. উসমানি নেতৃত্বের সামনে বুলগেরিয়ার অবনত হওয়া ১০৬
তিন. উসমানি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ক্রুসেডীয় খ্রিষ্টান সাম্রাজ্যগুলোর এক হওয়া ১০৬
চার . কুসতানতিনিয়া অবরোধ ১১০
পাঁচ. তৈমুর লং এবং বায়েজিদের মধ্যকার সংঘর্ষ ১১১
ছয়. উসমানি সাম্রাজ্যের বিভক্তি ১১২
সাত. অভ্যন্তরীণ গৃহযুদ্ধ ১১৫

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ১১৮
সুলতান প্রথম মুহাম্মদ ১১৮
ইনতেকাল ১২৪

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ১২৫
সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ ১২৫
এক. মুরাদ এবং তার শায়ের, আলেম এবং ভালো কাজের প্রতি ভালোবাসা পোষণ ১৩২
দুই. তার মৃত্যু এবং অসিয়ত ১৩৩

দ্বিতীয় অধ্যায়
সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ এবং কুসতানতিনিয়া বিজয় ১৩৫

প্রথম পরিচ্ছেদ ১৩৭
সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ ১৩৭
কনস্টান্টিনোপল বিজয় ১৩৮
এক : বিজয় অভিযানের জন্য তার প্রস্তুতি ১৪২
(ক) প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র যোগাড়ের ব্যাপারে সুলতানের গুরুত্ব প্রদান ১৪৩

(খ) নৌবহরের প্রতি গুরুত্ব প্রদান ১৪৪
(গ) চুক্তি সম্পাদন ১৪৪
দুই : অপ্রতিরোধ্য আক্রমণ ১৪৫
তিন : সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ এবং বাইজেন্টাইনদের মাঝে সংলাপ ১৪৯
চার : নৌবাহিনীর প্রধানকে বরখাস্ত করা এবং
সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহের বীরত্ব ১৫০
পাঁচ : সুলতানের বিরল সামরিক প্রতিভা ১৫১
ছয় : বাইজেন্টাইন সম্রাট এবং তার সহযোগীদের মাঝে বৈঠক ১৫৪
সাত : উসমানিদের আত্মোৎসর্গী যুদ্ধ ১৫৪
উসমানি সেনাবাহিনীর অভিনব হামলা ১৫৬
আট : সুলতান ফাতিহ এবং কুসতানতিনিয়াবাসীদের মাঝে শেষ সমঝোতা ১৫৮
নয় : সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহের মজলিসে শুরার সাথে বৈঠক ১৫৯
দশ : সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ কর্তৃক তার সেনাদের দেওয়া নির্দেশনা ১৬১
এগারো : আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিজয় এবং আসন্ন সাহায্য ১৬৪
বারো : পরাজিত খ্রিষ্টানদের সাথে সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহের আচরণ ১৬৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ১৬৯
আক্ষরিক অর্থে কনস্টান্টিনোপল বিজেতা শায়খ আক শামসুদ্দিন ১৬৯
শায়খ আক শামসুদ্দিন সুলতানের দাম্ভিকতার আশংকা করতেন ১৭২
ইনতেকাল ১৭৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ১৭৬
ইউরোপ এবং ইসলামিবিশ্বে
কুসতানতিনিয়া বিজয়ের প্রভাব ১৭৬
মিসরের সুলতানের কাছে প্রেরিত সুলতান ফাতিহের চিঠি হতে... ১৭৯
মক্কা শরিফের ইমামের কাছে সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহের চিঠি ১৮২
এখানে চিঠির কিছু অংশ উল্লেখ করা হলো— ১৮৩

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ১৮৫
কুসতানতিনিয়া বিজয়ের কারণ এবং উপকরণসমূহ ১৮৫
সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহের সময়ে উসমানি সাম্রাজ্যে
আল্লাহর শরিয়ত বাস্তবায়নের প্রভাব ১৯১
এক : নিশ্চয়ই তা অকাট্য এবং অগ্রগামী ১৯২
দুই : তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন পরিবর্ধন হবে না ১৯৩

তিন : তা অব্যাহত থাকবে। কখনো থেমে যাবে না ১৯৪
চার : তার বিরোধিতা করা যাবে না এবং তার বিরোধিতায় কোনো লাভ হবে না ১৯৪
পাঁচ : এর মাধ্যমে সীমালঙ্ঘনকারীরা উপকৃত হবে না কিন্তু
খোদাভীরুগণ তার মাধ্যমে উপদেশ গ্রহণ করবে ১৯৫
ছয় : জলে এবং স্থলে আল্লাহ তাআলার রীতি প্রয়োগ হয় ১৯৫

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ২০৩
সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহের বিশেষ গুণাবলি ২০৩
[১] সহনশীলতা ২০৩
[২] বীরত্ব ২০৩
[৩] মেধা ২০৪
[৪] দৃঢ়তা এবং অবিচলতা ২০৪
[৫] ন্যায়পরায়ণতা ২০৫
[৬] দৈহিক বল, অধিকসংখ্যক সৈন্যদল এবং বিস্তৃত সাম্রাজ্য
সত্ত্বেও গর্ব না করা ২০৫
[৭] ইখলাস তথা একনিষ্ঠতা ২০৫
[৮] ইলম তথা জ্ঞান ২০৬

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ২০৭
সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহের কিছু ঐতিহ্যবাহী কার্যক্রম ২০৭
মাদরাসা এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতি তার গুরুত্ব প্রদান ২০৭
উলামায়ে কেরামের প্রতি সুলতানের গুরুত্বারোপ ২০৮
কবি, সাহিত্যিকগণের প্রতি তার গুরুত্বারোপ ২১০
অনুবাদের প্রতি তার গুরুত্বারোপ ২১১
ভবন এবং হাসপাতাল নির্মাণের প্রতি তার গুরুত্বারোপ ২১২
ব্যবসা এবং শিল্পের প্রতি তার গুরুত্বারোপ ২১৩
প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার প্রতি তার গুরুত্বারোপ ২১৩
সেনাবাহিনী এবং নৌবাহিনীর প্রতি তার গুরুত্ব ২১৫
ন্যায়-ইনসাফের প্রতি তার গুরুত্বারোপ ২১৬

সপ্তম পরিচ্ছেদ ২১৯
ছেলের প্রতি সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহের উপদেশ ২১৯
সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহের মৃত্যু এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে তার প্রভাব ২৪৩
পরিশিষ্ট ২৪৭

প্রথম অধ্যায়

উসমানি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও তাদের বিজয় অভিযানসমূহ

ভূমিকা

উসমানিগণ হলেন একটি তুর্কি গোত্রীয় লোক। হিজরি সপ্তম শতাব্দী তথা খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কুর্দিস্তানে তাদের বসবাস ছিল। তারা রাখালী পেশায় নিয়োজিত ছিল। তাদের সময়কাল ছিল ইরাক এবং পূর্ব-এশিয়ায় চেঙ্গিজ খানের নেতৃত্বে মোঙ্গলীয় আক্রমণের পরবর্তী যুগ। কেননা, উসমানি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা উসমানের দাদা সুলাইমান ৬১৭ হিজরি মোতাবেক ১২২০ খ্রিষ্টাব্দে স্বীয় গোত্রের সাথে কুর্দিস্তান থেকে আনাতোলিয়া নামক এলাকায় হিজরত করেন। এরপর সেখানকার 'আখলাত' নামক শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।[১] ৬২৮ হিজরি তথা ১২৩০ খ্রিষ্টাব্দে তার মৃত্যু হলে তার মেজ ছেলে 'আরতুগ্রুল' তার উত্তরসূরি হন। তিনি আনাতোলিয়া থেকে আরও উত্তর-পশ্চিম দিকে সরে আসেন। তখন তার সাথে একশ' পরিবার এবং চারশ'র অধিক অশ্বারোহী ছিল।[২] যখন উসমানের পিতা আরতুগ্রুল মোঙ্গলীয়দের হামলা থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন তখন তার সাথে পরিবারের সংখ্যা চারশ'র অধিক ছিল না। সেখানে তারা বিকট আওয়াজ শুনতে পান। আওয়াজের কাছাকাছি যেতেই তারা মুসলিম এবং খ্রিষ্টানদের মাঝে ব্যাপক লড়াই দেখতে পান। তখন কনস্টান্টিনোপলের খ্রিষ্টানদের পাল্লা ভারি ছিল। এ অবস্থা দেখে আরতুগ্রুল পুরো শক্তি নিয়ে তার দ্বীনি ভাইদের সাহায্যে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ফলে খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের শক্তি ও সাহস উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সঞ্চার হয়।[৩] যুদ্ধের পর তৎকালীন ইসলামি 'সালজুক সাম্রাজ্য'-এর সেনাপতি 'আরতুগ্রুল' এবং তার সাথিদের এ অবদান স্বীকার করেন এবং এই অবদানের প্রতিদানস্বরূপ তিনি তাদের জন্য আনাজুলের পশ্চিম সীমান্তে রোমের পার্শ্ববর্তী একটি এলাকা বরাদ্ধ করে দেন।[৪] পাশাপাশি রোমের দিকে তাদের অঞ্চলকে

---

[১] আখলাত বর্তমান তুরস্কের পূর্বাঞ্চলীয় একটি শহর; যা আর্মেনিয়ার নিকটবর্তী।

[২] *কিয়ামুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ*, পৃষ্ঠা : ২৬।

[৩] *জাওয়ানিবু মুজিয়াহ ফি তারিখিল উসমানিয়্যিন*, জিয়াদ আবু গুনাইমাহ, পৃষ্ঠা : ৩৬।

[৪] *আল-ফুতুহুল ইসলামিয়্যাহ আবরাল উসুর*, ড. আবদুল আজিজ আল-উমরি, পৃষ্ঠা : ৩৫৩।

সম্প্রসারণের সুযোগ করে দেন। তাদের মাধ্যমে সালজুকিরা রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য শক্তিশালী এক মিত্রবাহিনী এবং সহযোগী পেয়ে যায়। সালজুকদের এবং এই উঠতি সাম্রাজ্যের মাঝে গভীর হৃদ্যতার সম্পর্ক তৈরি হতে থাকে। কারণ, ধর্ম এবং বিশ্বাসে তাদের উভয়ের শত্রু ছিল একই। আরতুগ্রুলের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এ হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় ছিল। ৬৯৯ হিজরি তথা ১২৯৯[৫] খ্রিষ্টাব্দে তার মৃত্যুর পর তার ছেলে উসমান তার উত্তরসূরি নির্বাচিত হন, যিনি রোম অঞ্চলে রাজত্ব সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে তার পিতার নীতি অনুসরণ করেন।[৬]

[৫] *তারিখু সালাতিনি আলি উসমান*, সাম আল-জাবি আল-কিবমানির তাহকিক, পৃষ্ঠা : ১০।

[৬] *তারিখু দাওলাতিল উলইয়া*, মুহাম্মদ ফরিদ, পৃষ্ঠা : ১১৫।

প্রথম পরিচ্ছেদ

উসমানি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা উসমান

৬৫৬ হিজরি মোতাবেক ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে আরতুগ্রুলের ছেলে উসমানের জন্ম হয়।[৭] তার দিকেই উসমানি সাম্রাজ্যকে সম্বন্ধিত করা হয়।[৮] তিনি যে-বছর জন্মগ্রহণ করেন, সে বছরই মোঙ্গলীয়রা হালাকু খাঁর নেতৃত্বে আব্বাসি খিলাফতের রাজধানী বাগদাদে আক্রমণ করে। এটি ছিল বেশ বড় এবং মর্মান্তিক একটি দুর্যোগ। এ সম্পর্কে আল্লামা ইবনে কাসির রহ. বলেন—

> তারা শহরে আক্রমণ করে সেখানকার সকল পুরুষ, মহিলা, বাচ্চা, বৃদ্ধ, যুবক যাদেরকেই নাগালে পেয়েছে হত্যা করেছে। অনেক মানুষ কূপ, বন্য জন্তুদের আবাস এবং ময়লার ভাগাড়ে গিয়ে লুকিয়ে থাকে। এভাবে তারা অনেকদিন আত্মগোপন করে থাকে। এক মুহূর্তের জন্যও বাইরে বের হতো না। একদল লোক সেখানকার সরাইখানাগুলোতে দরজা বন্ধ করে আত্মগোপন করে; কিন্তু তাতারিরা সেগুলো ভেঙে আগুন লাগিয়ে তাদের বের করে নিয়ে আসে। এরপর লোকেরা দূরদূরান্তে গিয়ে পালানোর চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত তারা মোঙ্গলীয়দের হাতে ধরা পড়ে। মোঙ্গলীয়রা তাদেরকে খোলা ময়দানে পেয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। রক্তে শহরের অলিগলির নালাসমূহ ভরে ওঠে। মসজিদ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও একই অবস্থা দেখা গিয়েছিল। ইহুদি, খ্রিষ্টান আর তাদের কাছে আশ্রয় প্রার্থনাকারী কতিপয় মুসলিম ছাড়া আর কেউই রেহাই পায়নি।[৯]

---

[৭] *সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ*, আবদুস সালাম আবদুল আজিজ, পৃষ্ঠা : ১২।

[৮] উসমানি খিলাফতকে অনেকেই তৃতীয় খলিফা সাইয়িদিনা উসমান বিন আফফান রা.-এর দিকে সম্বন্ধিত বলে ধারণা করে থাকেন। এটি সঠিক নয়; বরং যার নামের দিকে সম্বন্ধিত করে এই খিলাফতের নামকরণ করা হয়েছে ইতিহাসে, তিনি ৬৫৬ হিজরি মোতাবেক ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে জন্ম নেওয়া আরতুগ্রুলের ছেলে উসমান। তার কথাই লেখক এখানে আলোচনা করছেন।—সম্পাদক

[৯] *বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ১৯২-১৯৩।

এটি ছিল খুবই মর্মান্তিক একটি ঘটনা। পাপ আর গোনাহের ভারে উম্মাহর মনোবল তখন ছিল দুর্বল। এ জন্যই আল্লাহ তাদের ওপর মোঙ্গলীয়দের চাপিয়ে দিয়েছিলেন। তারা এসে সম্ভ্রম লুটেছে। রক্তনদী প্রবাহিত করেছে। লোকদের হত্যা করেছে। সম্পদ লুটতরাজ করেছে। ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত করেছে। উম্মাহর সেই কঠিন, দুর্যোগময় এবং দুর্বলতার সময়টাতে উসমানি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা উসমানের জন্ম হয়। দুর্বলতা এবং পতনের কিনারা হতে তিনি উম্মাহর ক্ষমতার সূচনা করেন। এখান থেকেই সম্মান, সাহায্য এবং ক্ষমতায়নের দিকে মুসলিম জাতির ঊর্ধ্বগমন শুরু হয়। সবকিছুই ছিল আল্লাহ তাআলার হিকমত এবং তাঁর ইচ্ছায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَ جَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَ يَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ. إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ-

(ফিরাউন তার দেশে উদ্ধত হয়েছিল এবং সে দেশবাসীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে তাদের একটি দলকে দুর্বল করে দিয়েছিল। সে তাদের পুত্র-সন্তানদেরকে হত্যা করত এবং নারীদেরকে জীবিত রাখত। নিশ্চয় সে ছিল ফিতনা সৃষ্টিকারী।) [সূরা কাসাস, আয়াত : ৪]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

وَ نُرِيْدُ أَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَّ نَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ وَ نُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ -

(জমিনে যাদেরকে দুর্বল করা হয়েছিল, আমার ইচ্ছা হলো তাদের প্রতি অনুগ্রহ করার, তাদেরকে নেতা করার এবং তাদেরকে দেশের উত্তরাধিকারী করার এবং তাদেরকে দেশের ক্ষমতায় আসীন করার।) [সূরা কাসাস, আয়াত : ৫, ৬]

আল্লাহ তাআলা চাইলে তার দুর্বল বান্দাদেরকে সকাল অথবা সন্ধ্যায় এমনকি চোখের পলকের মাঝেই ক্ষমতাশালী বানাতে পারেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنٰهُ أَنْ نَّقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ -

(আমি যখন কোনো কিছু করার ইচ্ছা করি তখন বলি হও, আর তা হয়ে যায়।) [সূরা নাহল, আয়াত : ৪০]

আল্লাহ তাআলা ক্ষমতা এবং সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু আহলে হকরা তা তরান্বিত হওয়ার কামনা করে না; বরং তারা বিশ্বাস করে তা সঠিক সময়েই আসবে। তাই শরিয়তের রীতিনীতি এবং বৈশ্বিক রীতিনীতির প্রতি লক্ষ্য রাখা অত্যন্ত জরুরি। আর আল্লাহ তাআলার দ্বীনের ওপর ধৈর্যধারণের কোনো বিকল্প নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَ لَوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَ لٰكِنْ لِّيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ـ

(আল্লাহ তাআলা চাইলে অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করতে পারেন; কিন্তু তিনি তোমাদেরকে পরস্পরের মাধ্যমে পরীক্ষা করতে চান।)
[সুরা মুহাম্মদ, আয়াত : ৪]

আর আল্লাহ তাআলা যখন কোনো কিছুর ইচ্ছা করেন, তখন তিনি তার উপকরণসমূহ প্রস্তুত করেন এবং অল্প অল্প করে তা বাস্তবায়িত করেন। একবারেই তা সম্পূর্ণ করেন না।

তদ্রূপ উসমানি সালতানাতের ক্ষমতালাভের গল্পটা শুরু হয় অল্প অল্প করেই। সেনাপতি উসমানের উত্থানের মধ্য দিয়ে। যিনি জন্মগ্রহণ করেন আব্বাসীয় খিলাফতের পতনের বছর।

কৃষ্ণ সাগর
البحر الأسود
طرابزون
রোমের সালজুক সালতানাত
سلاجقة الروم
কোতাহিয়াহ
كوتاهية
কোনিয়া
قونية
হালব
حلب
ভূমধ্য সাগর
البحر المتوسط
প্রতিষ্ঠাকালীন উসমানি সাম্রাজ্যের সীমারেখা

এক. প্রথম উসমানের নেতৃত্বমুলভ উল্লেখযোগ্য গুণাবলি

প্রথম উসমানের জীবন নিয়ে ভাবতে গেলে আমাদের সামনে তার ব্যক্তিত্বের কয়েকটি গুণ ভেসে ওঠে। যেমন—তিনি ছিলেন একজন দক্ষ সেনাপতি, বিজ্ঞ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তার সবচেয়ে গুরুত্ববহ এবং উল্লেখযোগ্য গুণাবলি হচ্ছে—

[১] বীরত্ব : ৭০০ হিজরি মোতাবেক ১৩০১ খ্রিষ্টাব্দে কনস্টান্টিনোপলের বুরুসা, মাদানুস, আদ্রানুস, কাস্তাহ, কাস্তালাহ প্রভৃতি অঞ্চলের খ্রিষ্টান রাজারা উসমানি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা উসমান বিন আরতুগ্রুলের বিরুদ্ধে ক্রুসেডের ডাক দেয়। খ্রিষ্টানরা এতে ব্যাপকভাবে সাড়া দেয় এবং এই উঠতি সালতানাতের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের শপথ গ্রহণ করে। উসমান তার সৈন্যদল নিয়ে এগিয়ে যান। যুদ্ধের ময়দানে অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করে তিনি ক্রুসেড-যোদ্ধাদের বিচ্ছিন্ন করে দেন। তার বীরত্ব উসমানিদের কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে যায়।[১০]

[২] হিকমত বা প্রজ্ঞা : স্বীয় গোত্রের নেতৃত্ব হাতে নেওয়ার পর তিনি ভেবে দেখলেন, খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে সুলতান আলাউদ্দিনের সাথে মিলিত হয়ে সুসম্পর্ক বজায় রেখে অবস্থান করা বুদ্ধির কাজ হবে। তাই তিনি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শহর এবং দুর্গ-জয়ে সুলতানকে সাহায্য করেন। এর ফলে তিনি রোমের সালজুক সুলতান আলাউদ্দিনের দরবারে আমির হওয়ার মর্যাদা লাভ করেন। তিনি তার অধীন অঞ্চলে সুলতানের নামে মুদ্রা চালু করেন এবং জুআর খুতবায় তার নামে দোয়া চালু করেন।[১১]

[৩] ইখলাস তথা একনিষ্ঠতা : উসমানের নেতৃত্বাধীন অঞ্চলের আশপাশের লোকেরা দ্বীনের জন্য তার ইখলাস এবং একনিষ্ঠতা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তারা ইসলামি সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে তার সমর্থন এবং তার সাথে অবস্থান করে ইসলাম এবং মুসলিমদের শত্রুদের বিরুদ্ধে মজবুত প্রাচীররূপে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন।[১২]

[৪] সবর তথা ধৈর্য : যখন তিনি বিভিন্ন দুর্গ এবং শহর জয় করা শুরু করেন, তখন তার এই গুণটি প্রকাশ পেতে শুরু করে। ৭০৭ হিজরিতে তিনি কাস্তাহ, লাফকাহ, আক্কে হিসার এবং কওজে হিসার দুর্গ জয় করেন। আর ৭১২ হিজরিতে কাবওয়াহ, ইয়াকিজাহ তোরাক্লু এবং তাকাররুর বিকারি দুর্গ জয় করেন। ৭১৭ হিজরি মোতাবেক ১৩১৭ খ্রিষ্টাব্দে বুরুসা জয়ের মধ্য দিয়ে তিনি বিজয়যাত্রার শীর্ষচূড়ায় উঠেছিলেন। কয়েক বছরব্যাপী দীর্ঘ অবরোধের পর এই জয় ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হন তিনি। বুরুসা জয় করা কোনো সহজসাধ্য কাজ ছিল না। বলা যায়, উসমানের অভিযানসমূহের মধ্যে

---

[১০] *জাওয়ানিবুল মুজিয়াহ ফি তারিখিল উসমানিয়িনাল আতরাক*, পৃষ্ঠা : ১৯৭।
[১১] *কিয়ামুদ দাওলাতিল উসমানিয়াহ*, পৃষ্ঠা : ২৫।
[১২] *কিয়ামুদ দাওলাতিল উসমানিয়াহ*, পৃষ্ঠা : ২৬।

সবচেয়ে কঠিন ছিল এটি। এ সময় উসমান এবং বুরুসার অধিপতি ইকরিনুসের মাঝে কয়েক বছরব্যাপী কঠিন যুদ্ধ হয়। অবশেষে বুরুসার অধিপতি আত্মসমর্পণ করে উসমানের হাতে শহরকে তুলে দেয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَ صَابِرُوْا وَ رَابِطُوْا وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ۔

{হে মুমিনগণ, তোমরা ধৈর্যধারণ করো, তার ওপর অটল থাক এবং পরস্পর সম্পর্ক স্থাপন করো। আর আল্লাহকে ভয় করো—যাতে তোমরা সফলকাম হও।} [সূরা আলে-ইমরান, আয়াত : ২০০]

[৫] ইমানি জজবা : বুরুসার অধিপতি ইকরিনুসের সাথে যুদ্ধের সময় তার এই গুণের কথা জানা যায়। যুদ্ধ-শেষে ইকরিনুস ইসলাম গ্রহণ করে। সুলতান উসমান তাকে বেক উপাধি প্রদান করেন। এরপর সে উসমানি সালতানাতের প্রথম সারির সেনাপতিদের কাতারে পৌঁছে যায়। অনেক কন্সটান্টিনোপলিয়ান সেনাপতি উসমানের ব্যক্তিত্বে প্রভাবিত ছিলেন। তারা উসমানের দেখিয়ে যাওয়া পথ অনুকরণ করে উসমানি সালতানাতকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। তখন অনেক মুসলিম সৈন্যদল উসমানি সালতানাতের পতাকাতলে একতাবদ্ধ হয়। তাদের মধ্যে ছিল গাজিয়ারোম অর্থাৎ রোমের একদল যোদ্ধাদের দল। তারা হলো এমন একটি মুসলিম সৈন্যদল, যারা আব্বাসীয় খিলাফতের সময় থেকে রোম সীমান্তে একতাবদ্ধভাবে অবস্থান করত এবং মুসলিমদের ওপর রোমীয়দের আক্রমণ প্রতিহত করত। তাদের এই পারম্পরিক সম্প্রীতি রোমের যুদ্ধে তাদেরকে আলাদা মর্যাদা দান করে। এতে করে ইসলামের ব্যাপক সমৃদ্ধি ঘটে এবং ইসলামি নিয়মকানুনের প্রসার ঘটে।

আরেকদল ছিল ইখওয়ান অর্থাৎ ভাইদের দল। তারা ছিল অত্যন্ত ভালো একটি দল—যারা মুসলিমদেরকে সাহায্য করত, তাদের মেহমানদারি করত এবং যোদ্ধাদের সেবা করার জন্য সৈন্যদলের সাথে অবস্থান করত। এই দলের সিংহভাগ লোক ছিলেন ব্যবসায়ী। তারা ইসলামের খেদমতের জন্য তাদের সম্পদ ব্যয় করেছিলেন। যেমন—মসজিদ, সরাইখানা ইত্যাদি নির্মাণ করা। উসমানি সালতানাতে তারা বেশ মর্যাদার আসনে আসীন ছিলেন। এই দলগুলোর মধ্যে একদল বিজ্ঞ আলেম ছিলেন; যারা ইসলামি সভ্যতার বিস্তৃতি এবং প্রচার-প্রসারে কাজ করেছেন। লোকদেরকে ধর্মীয় জীবনযাপনে আগ্রহী করেছিলেন।

আরেকদল ছিল হাজিয়াতে রোম অর্থাৎ রোমের হাজিদের কাফেলা। ইসলামি ফিকহ নিয়ে কাজ করত আরেকটি দল। তারা শরিয়তের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে গবেষণা

করতেন। তাদের লক্ষ্য ছিল, সাধারণ মুসলিমদেরকে সাহায্য করা। বিশেষত মুজাহিদদের সাহায্য করা। এ ছাড়া আরও অন্যান্য দলের লোকেরাও ছিল।[১৩]

[৬] **ন্যায়পরায়ণতা :** অধিকাংশ তুর্কি ইতিহাসগ্রন্থ হতে জানা যায়, ৬৮৩ হিজরি মোতাবেক ১২৮৫ হিজরিতে কনস্টান্টিনোপলের খ্রিষ্টানদের কাছ থেকে কুরুহজাহ দুর্গ জয় করার পর আরতুগ্রুল তার ছেলে উসমানের হাতে সে অঞ্চলের শাসনভার ন্যস্ত করেছিলেন। তখন উসমান তুর্কি মুসলিমদের বিপরীতে কনস্টান্টিনোপলের খ্রিষ্টানদের শাসন করেছিলেন। এতে অভিভূত হয়ে এক খ্রিষ্টান উসমানকে জিজ্ঞেস করেছিল, কীভাবে আপনি আমাদের কল্যাণ সাধন করেন? অথচ আমরা আপনার ভিন্ন ধর্মাবলম্বী।

উসমান জবাব দিয়েছিলেন, আমি কেনইবা তোমাদের কল্যাণ কামনা করব না! আমরা তো আল্লাহ তাআলারই ইবাদত করি। তিনি আমাদেরকে বলেছেন—

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ـ

(নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন, তোমরা আমানতকে তার হকদারের কাছে পৌঁছে দাও এবং ন্যায়পরায়ণতার সাথে শাসন করো।) *[সুরা নিসা : আয়াত : ৫৮]*

তার এই ন্যায়পরায়ণতার কারণে লোকটি তার গোত্রসহ ইসলাম গ্রহণ করে।[১৪]

প্রথম উসমান তার বিজিত এলাকায় প্রজাদের সাথে ইনসাফের সাথে শাসন করেছেন। পরাজিত লোকদের ওপর তিনি কখনো জুলুম-অত্যাচার করেননি। তাদের ওপর জোরজবরদস্তি, সীমালঙ্ঘন এবং কঠোরতা করেননি। তাদের সাথে আল্লাহ তাআলার এই কথা অনুযায়ী আচরণ করেছেন—

أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا ۝ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ـ

(যারা অত্যাচার করে আমি অচিরেই তাদের শাস্তি দেব। অতঃপর তাদেরকে তাদের প্রভুর কাছে প্রত্যাবর্তিত করা হবে। তিনি তাদের কঠিন শাস্তি দান করবেন। আর যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান এবং আমি তাদেরকে সহজ কাজের আদেশ দেব।) *[সুরা কাহফ, আয়াত : ৮৭-৮৮]*

---

[১৩] *আততারাজুমুল হাজারি ফিল আলামিল ইসলামি*, ড. আলি আবদুল হালিম, পৃষ্ঠা : ৩৩১-৩৩২।
[১৪] *জাওয়ানিবু মুজিয়্যাহ*, পৃষ্ঠা : ৩৩।

আর আল্লাহ তাআলার নির্দেশিত এই পন্থা অনুযায়ী আমল করাই তার ইমান, আল্লাহভীরুতা, বুদ্ধি এবং মেধার কথা জানান দেয়। সেইসাথে আরও স্মরণ করিয়ে দেয় তার সততা, ন্যায়পরায়ণতা এবং দয়ার গুণাবলিকে।

[৭] বিশ্বস্ততা : অঙ্গীকার রক্ষা করাকে তিনি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতেন। কনস্টান্টিনোপলের উলুবাদ দুর্গের অধিপতি উসমানি সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করার সময় শর্ত দিয়েছিল, পুলের ওপর দাঁড়ানো কোনো মুসলিম-সৈন্য যেন দুর্গে প্রবেশ না করে। তিনি তা মেনে নিয়েছিলেন। আর এভাবে তার পরবর্তীরাও তা মেনে নিয়েছে।[১৫]

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ـ

(তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূরণ করো। নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।) [সুরা আল-ইসরা : আয়াত : ৩৪]

[৮] আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা : তার বিজয় অভিযানগুলো একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হতো। তার শাসন এবং বিজয় অভিযানসমূহ কোনো অর্থনৈতিক অথবা সামরিক ফায়েদার উদ্দেশ্যে ছিল না; বরং তা ছিল আল্লাহর দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া এবং তার দ্বীনকে প্রচার করা। এ জন্যই ইতিহাসবিদ আহমদ রফিক তার গ্রন্থ *আত-তারিখুল আম্মিল কাবির*-এ তাঁর সম্পর্কে বলেন—

উসমান ছিলেন চূড়ান্ত পর্যায়ের ধর্মভীরু। তিনি জানতেন ইসলাম ধর্মের প্রচার-প্রসার এবং তাকে সর্বজনীন করা একটি পবিত্র আবশ্যকীয় কাজ। তিনি ছিলেন দূরদর্শী এবং দৃঢ় রাজনৈতিক চিন্তাবিদ। তিনি সুলতান হওয়ার লোভে তার সালতানাতের প্রতিষ্ঠা করেননি; বরং ইসলামের প্রচারের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছেন।[১৬]

মিসর উগুলো বলেন—

উসমান বিন আরতুগ্রুল ছিলেন পোক্তো ইমানের অধিকারী। আল্লাহর কালিমাকে উঁচু করাই ছিল তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। তিনি তার সকল শক্তি ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে এ লক্ষ্য বাস্তবায়নেই তৎপর ছিলেন।[১৭]

এগুলো ছিল প্রথম উসমানের কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তাআলার প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস, আখেরাত দিবসের জন্য তার প্রস্তুতি, আহলে ইমানের প্রতি তার

[১৫] *আওয়ানিবু মুজিয়াহ*, পৃষ্ঠা : ৩৩।
[১৬] প্রাগুক্ত।
[১৭] প্রাগুক্ত।